কিন্নর দল

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মণি ডাক্তার

আষাঢ় মাসের প্রথমে জ্যৈষ্ঠের গরমটা কাটিয়া গিয়াছে তাই রক্ষা, যে কষ্ট পাইয়াছিলাম গতমাসে! এই বাগানঘেরা হাটতলায় কি একটু বাতাস আছে?

কিছু করিতে পারিলাম না এখানেও। আছি তো আজ দেড় বছর। শুধু এখানে কেন, বয়স তো প্রায় বত্রিশ তেত্রিশ ছাড়াইতে চলিয়াছে, এখনও পর্য্যন্ত কি করিলাম জীবনে? কত জায়গায় ঘুরিলাম, কোথাও না হইল পসার, না জমিল প্র্যাকটিস্। বাগ আঁচড়া, কলারোয়া, শিমুলতলী, সত্রাজিৎপুর, বাগান গাঁ, কত গ্রামের নামই বা করিব। কোথাও মাস কয়েকের বেশী চলে না। এই পলাশপাড়ায় যখন প্রথম আসি, বেশ চলিয়াছিল কয়েক মাস। ভাবিয়াছিলাম ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিলেন বুঝি। কিন্তু তার পরেই কি যে ঘটিল, আজ কয়েক মাস একটী পয়সারও মুখ দেখিতে পাই না।

এখন মনে হয় কুণ্ডু বাবুদের আড়তে যখন চাকুরী করিতাম শ্যামবাজারে, সেই সময়টাই আমার খুব ভাল গিয়াছে। আমাদের গ্রামের একজন লোক চাকুরীটা জুটাইয়া দিয়াছিল; খাতাপত্র লিখিতাম, হাতের লেখা দেখিয়া বাবুরা খুসী হইয়াছিল। আট নয় মাসের বেশী সেখানে ছিলাম; তার মধ্যে কলিকাতায় যাহা কিছু দেখিবার আছে, সব দেখিয়াছি। চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, বায়োস্কোপ, থিয়েটার, পরেশনাথের বাগান, কালীঘাটের কালীমন্দির। কি জায়গাই কলিকাতা!

পারি না বলিয়া শাশুড়ী ঠাকৃরুণ মহা অসন্তুষ্ট, তিনি ভাবেন কত টাকাই রোজগার করিতেছি ডাক্তারীতে।

কেহ বলিলে হয় তো বিশ্বাস করিবে না, আজ চার পাঁচ মাস এক রকম শুধু ভাত খাই। পাড়াগাঁ হইলেও এখানে জিনিসপত্র উৎপন্ন হয় না বলিয়া অতিরিক্ত আক্রা—পটল দুই আনা সের, আলু ছয় পয়সা। মাছ চার আনা, ছয় আনার কম নয়। কেহ দেখিতে পাইবে বলিয়া খুব ভোরে নদীর ধার হইতে শুশুনি আর কাঁচড়াদাম শাক তুলিয়া আনি মাঝে মাঝে। আজকাল আমের সময়, শুধু আম ভাতে আর ভাত; কতদিন শুধু নুন দিয়াই ভাত খাইয়াছি।

পাশ করা ডাক্তার নই, কিন্তু তাতে কি? বাড়ী বসিয়া বই পড়িয়া কি আর ডাক্তারী শেখা যায় না? আজ সাত আট বছর তো ডাক্তারী করিতেছি, অভিজ্ঞতা বলিয়া একটা জিনিসও তো আছে! পাশকরা ডাক্তারের হাতে কি আর রোগী মরে না? ধোপাখালির ইন্দু ডাক্তার আসিয়া বিধু গোয়ালিনীর মেয়েটাকে বাঁচাইতে পারিয়াছিল?

তবে কেন যে দুষ্ট লোকে রটাইয়াছে, মণি ডাক্তারের ওষুধ খাইলে জ্যান্ত মানুষ মরিয়া ভূত হয়, ইহার কারণ কে বলিবে? আমি গরীব বলিয়া আমার দিকে কেউ হয় না, এক মুজিবর ছাড়া—ঐ লোকটা আজ তিন চার মাস বিনা আপত্তিতে নিজের দোকান হইতে চাল ডাল না দিলে আমাকে উপবাস করিতে হইত। সে আমার জন্য যত করিয়াছে, এ অঞ্চলের কেহ তাহার সিকিও কোনদিন করে নাই। তাহার ঋণ কখনও শোধ করিতে পারিব না।

এ সব অজ-পাঁড়াগাঁ। রেলষ্টেশন হইতে দশ বারো ক্রোশ দূরে। কাছে কোন বড় বাজার কি গঞ্জ নাই, লোকজন নিতান্ত অশিক্ষিত; রোগ হইলে ডাক্তার ডাকার বদলে জল-পড়া, তেল-পড়া দিয়া কাজ

সারে। ফকির ডাকাইয়া ঝাড়ফুঁক করে, বলে অপদেবতার দৃষ্টি হইয়াছে। ডাক্তার ডাকিবার রেওয়াজই নাই।

বাড়ী যাই নাই আজ দেড় বছর। পলাশপাড়া আসিবার আগে কিছুদিন ছিলাম সত্রাজিৎপুরে, তখন হইতেই যাই নাই। বাড়ী মানে শ্বশুরবাড়ী—নিজের বাড়ীঘর বলিয়া কিছু নাই অনেক দিন হইতেই। শ্বশুরবাড়ী যাইতে হইলে আট ক্রোশ হাঁটিয়া নাভারণ ষ্টেশনে রেলে চাপিতে হইবে। সেখান হইতে মসলন্দপুর ষ্টেশনে নামিয়া মোটরবাসে যাইতে হইবে খোলাপোতা। সেখানে মার্টিন লাইনের ছোট রেলে হাসনাবাদ পর্য্যন্ত গিয়া ইছামতীতে নৌকায় ছয় সাত ঘণ্টা গেলে তবে শ্বশুরবাড়ী। সবশুদ্ধ তিন চার টাকা খরচ পড়ে—যখনই টাকা হাতে আসিয়াছে, তখনই মণি অর্ডার করিয়া সুবাসিনীর নামে পাঠাইয়া দিয়াছি—তিন চার টাকার মুখ একসঙ্গে কমই দেখিয়াছি আজ দু'বছরের মধ্যে। টাকা না পাঠাইলে শাশুড়ী ঠাকরুণের আর আমার বিধবা শালীর গঞ্জনার চোটে বেচারীকে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে হয়।

তাই এবার যখন আসি, খাওয়া-দাওয়া সারিয়া নৌকায় চড়িব, সুবাসিনী কোণের ঘরে ডাকিয়া বলিল—শোন এবার আমায় এখানে বেশীদিন ফেলে রেখ না—তুমি যেখানেই থাক, আমায় নিয়ে যেয়ো শীগ্‌গীর।

—সেই সব পাড়াগাঁয়ে কি আর থাকতে পারবে?

—এই বা এমন কি সহর? তা ছাড়া তুমি যেখানে থাকবে, সেইখানেই আমার সহর। এখানে দিদির বাক্যির জ্বালায় এক এক সময় মনে হয় গলায় দড়ি দিই, কি গাঙে ডুবে মরি।

—সবই বুঝি সুবি, আমার যদি একটুকু সংস্থান হয় কোথাও, তবে তোমাকে ঠিক সেখানে নিয়ে যাবো। আমিই কি তোমাকে আর কোথাও ফেলে মনের সুখে থাকি ভাবো? তবে কি করি বল—

দরজার বাহিরে পা দিয়াছি, শাশুড়ী ঠাকরুণ ওৎ পাতিয়া ছিলেন, বলিলেন—তুমি বাপু অমনি নিউদ্দিশ হয়ে থেক না গিয়ে। আমার এই অবস্থা, সংসারে একপাল কুপুষ্যি, কোথা থেকে কি করি বল তো? এক কাঁড়ি দুধের দেনা গোয়ালার কাছে, ছেঁড়া কাপড় পরে পরে দিন কাটায়, মা হয়ে চোখের সামনে দেখতে পারিনে বলে এক জোড়া কাপড় কিনে এনে দিয়েছিলাম, তার দাম এখনও বাকী—তোমার তো বাপু এখান থেকে চলে গেলে আর চুলের টিকি দেখা যায় না—কি যে আমি করি, এমন পুরুষ মানুষ বাপের জন্মে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই অবস্থায় আসিয়া আজ দেড় বৎসর শ্বশুরবাড়ী মুখো হই নাই। অবশ্য এর মধ্যে মাঝে মাঝে হাতে যখন যা আসিয়াছে, সুবাসিনীর নামে পাঠাইয়া দিয়াছি—কিন্তু সব শুদ্ধ ধরিলে, খরচের তুলনায় তার পরিমাণ খুব বেশী তো নয়। কিন্তু আমি কি করিব, চুরি-ডাকাতি তো করিতে পারি না।

সত্যই সুবাসিনীকে বিবাহ করিয়া পর্য্যন্ত বেশী দিন তাহার সঙ্গে একত্র থাকিবার সুযোগ আমার হয় নাই। প্রথম প্রথম ভাবিতাম, একটা কিছু সুবিধা হইলেই তাহাকে লইয়া গিয়া কাছে রাখিব। কিন্তু বিবাহ করিয়াছি আজ ছয় সাত বছর, তার মধ্যে এ সুযোগ কখনও হইল না। শ্বশুরবাড়ীতেই বা গিয়া কয়দিন থাকা যায়, একে তো মেয়ে এতকাল ধরিয়া রহিয়াছে, তার উপর জামাই গিয়া দুদিনের বেশী দশদিন থাকিলেই শাশুড়ী ঠাকরুণ স্পষ্ট বিরক্ত হইয়া উঠেন বেশ বুঝিতে পারি, কাজেই বুদ্ধিমানের মত আগেই সরিয়া পড়ি। নিজের মান নিজের কাছে।

একদিন শুনিলাম পানখোলার পাঠশালায় একজন মাষ্টারের পোষ্ট খালি আছে। মুজিবর রহমানের দোকানে সকালে বিকালে বসিয়া

দুই একটা সুখ-দুঃখের কথা বলি, সে আমায় পরামর্শ দিল, মাষ্টারির জন্যে চেষ্টা দেখিতে।

বাড়ী আসিয়া কথাটা ভাবিলাম। সাত আট বছর ডাক্তারি করিয়া তো দেখা গেল পেটের ভাত জুটান দায়—তবুও একটা বাঁধা চাকুরী করিলে, মাস গেলে যত কমই হোক, কিছু হাতে আসিবে।

খবর লইয়া জানিলাম, মকরন্দপুরের শ্রীনাথ দাস ঐ পাঠশালার সেক্রেটারী। পরদিন সকালে রওনা হইলাম মকরন্দপুরে।

মকরন্দপুর এখান হইতে সাত আট ক্রোশের কম নয়। সকালে স্নান সারিয়া দুটি চাল গালে দিয়া জল খাইয়া বাহির হইলাম। মকরন্দপুর কোন্ দিকে আমার ঠিকমত জানা ছিল না, পলাশপুর ছাড়াইয়া অম্বিকাপুরের কলুবাড়ীর কাছে যাইতে কলুরা বলিয়া দিল ঝিটকিপোতার খেয়া পার হইয়া নকফুলের মধ্যে দিয়া গেলে, দেড় ক্রোশ রাস্তা কম হইতে পারে।

সকাল আটটার মধ্যে খেয়া পার হইলাম। একটি ছোট ছেলে আমার সঙ্গে এক নৌকায় পার হইল। মাঠের মধ্যে কিছুদূর গিয়া সে একটা বটগাছের তলা দেখাইয়া বলিয়া দিল—ঐ গাছতলা দিয়ে চলে যান বাবু, বাঁ দিকে নকফুলের রাস্তা।

রোদ বেশ চড়িয়াছে। ছোট একটা খাল হাঁটিয়া পার হইয়া বড় একটা আমবাগানের ভিতরে গিয়া পড়িলাম। এ সব অঞ্চলের আমবাগান মানে গভীর জঙ্গল। তার মধ্যে অতি কষ্টে পথ খুঁজিয়া লইয়া বাগানটা পার হইয়া যাইতেই একটা কোঠাবাড়ী দেখা গেল। ক্রমে অনেকগুলি দালান-কোঠা পথের ধারে দেখা যাইতে লাগিল। অধিকাংশই পুরাতন, প্রাচীন কার্ণিসে দেওয়ালে বট-অশ্বত্থের চারা গজাইয়াছে। গ্রামখানা ছাড়াইয়া মাঠের মধ্যে একটা বটগাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। পিপাসা পাইয়াছে। ভাবিলাম,

নকস্থলে কাহারও বাড়ী জল চাহিয়া খাইলেই হইত। এদিকে শুধুই মাঠ, নিকটে আর কোন গ্রামও তো নজরে পড়ে না।

পুনরায় পথ হাঁটিতে লাগিলাম। পথে সবই চাষাদের গাঁ পড়িতে লাগিল। ব্রাহ্মণ মানুষ, যেখানে সেখানে তো জল খাইতে পারি না!

সুঁদরপুর, চাতরা, নলদি, মামুদপুর···

তারপরই পড়িল আর একটা মাঠ। বেলা তখন দুপুর ঘুরিয়া গিয়াছে। কিছু খাইতে পাইলে ভালই হইত—পেট জ্বলিয়া উঠিল। আপাততঃ জল খাইলেও চলিত। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড কি ছাই এ দিকে কোথাও একটা টিউব-ওয়েলও করিয়া দেয় নাই কোন গ্রামে? মাঠের মধ্যে কোথাও কি একটা পুকুর নাই?

মেটেরাস্তায় হাঁটিয়া যখন নদীর ধারে পৌঁছিলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। পৌঁছিয়া দেখি খেয়াঘাট কচুড়িপানায় বুঁজিয়া গিয়াছে, খেয়ার নৌকাখানি ডুবানো অবস্থায় এপারে বাঁধা। কোনও জনপ্রাণী নাই।

কি বিপদ! এখন পার হওয়ার কি করি? নিকটে একটা চাষা গাঁ। সেখানে খোঁজ লইয়া জানিলাম, কচুড়িপানায় ঘাট বুঁজিয়া যাওয়ায় সেখানকার খেয়া আজ মাসখানেক যাবৎ বন্ধ। আরও ক্রোশখানেক উজানে খালিশপুরের ঘাটে খেয়া পড়িতেছে।

এই অবস্থায় মাঠ ভাঙিয়া এক ক্রোশ নদীর ধারে ধারে খালিশপুর পর্য্যন্ত যাওয়া তো দেখিতেছি বড় কষ্ট! পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—পোয়াটাক পথ গিয়া একটা বড় শিমুলগাছের নীচে নদী হাঁটিয়া পার হওয়া যায়।

অন্ধকারে আধ মাইল হাঁটিয়া নদীর পারে একটা শিমুল গাছ দেখা গেল বটে, কিন্তু জল সেখানে বিশেষ কম বলিয়া মনে হইল না। জলে তো নামিলাম, জল ক্রমে হাঁটুর উপর ছাড়াইয়া কোমরে

উঠিল। কোমর হইতে বুক, বুক হইতে গলা। কাপড়-জামা ভিজিয়া ন্যাতা হইয়া গেল—তখনও জল উঠিতেছে—নাকে আসিয়া যখন ঠেকিল, তখন পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়া ডিঙি মারিয়া চলিতেছি। অন্ধকার হইয়া গিয়াছে,—ভয় হইল এক। এই অন্ধকারে অজানা নদী পার হইতে কুমীর না ধরে! বড় কুমীর না আসুক, দুই একটা মেছো কুমীরেও তো শুঁতাটা আসূটা দিতে পারে!

কোন রকমে ওপারে গিয়া উঠিলাম। কোন দিকে লোকালয় নাই, একটা আলোও জ্বলে না এই অন্ধকারে। একটা জায়গায় মাঠের মধ্যে দুইদিকে রাস্তা গিয়াছে। মকরন্দপুরের রাস্তা কোন্ দিকে—ডাইনে না বাঁয়ে? কে বলিয়া দিবে, জনমানবের চিহ্ন নাই কোথাও। ভাগ্য আবার এমনি, ভাবিয়া চিন্তিয়া যে পথটি ধরিলাম, সেইটিই কি ঠিক ভুল পথ! আধক্রোশ তিনপোয়া পথ হাঁটার পরে এক বাগ্দীবাড়ীতে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—আমি তিনপোয়া পথ উল্টা-দিকে আসিয়া পড়িয়াছি। যাওয়া উচিত ছিল ডাইনের পথে, আসিয়াছি বাঁয়ের পথে।

আবার তখন ফিরিয়া গিয়া সেই পথের মোড়ে আসিলাম। সেখান হইতে ডাইনের পথ ধরিলাম। এইবার পথে বিষম জঙ্গল। বড় বড় আমবাগান, বাঁশবন, আর ভয়ানক আগাছার জঙ্গল। আমি জানিতাম, এখানে খুব বাঘের ভয়। দিনমানে গরু-বাছুর বাঘে লইয়া যায়—একবার আমি একটা রোগীর চিকিৎসা করি, তাহার কাঁধে গো-বাঘায় থাবা মারিয়াছিল।

ভীষণ অন্ধকার—রাস্তা হাঁটা বেজায় কষ্ট, পাকা আম পড়িয়া পথ ছাইয়া আছে—এ সব অঞ্চলে এত আম যে, আমের দর নাই, তলায় পড়া আম কেউ বড় একটা কুড়ায় না। অন্ধকারে আমের উপর পা দিয়া পা পিছলাইয়া যাইতে লাগিল। আম তো ভাল,

সাপের ঘাড়ে পা দিলেই আমার ডাক্তারলীলা অচিরাৎ সাঙ্গ করিতে হইবে, তাই ভাবিতেছি।

অতি কষ্টে মকরন্দপুর পৌঁছিলাম রাত নয়টার সময়। সেক্রেটারী শ্রীনাথ দাসের বাড়ীতেই রাত্রে আশ্রয় লইলাম। কিন্তু চাকুরি মিলিল না, যাতায়াতই সার। পরদিন সকালে শ্রীনাথ দাস বলিল—এ মাসে নয়, আশ্বিন মাস থেকে ভাবছি লোক নেব। ইস্কুলের অবস্থা ভাল নয়। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের সাহায্য আছে মাসে দশ আনা, সেইটিই ভরসা। ছাত্রদত্ত বেতন মাসে ওঠে মোট তের সিকে। দুজন মাষ্টার কি করে রাখি? তা আপনি আশ্বিন মাসের দিকে একবার খোঁজ করবেন।

গেল মিটিয়া। আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত থাই কি যে পানখোলা ইউ-পি পাঠশালার দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদের জন্য বসিয়া থাকিব! বেতন শুনিলাম পাঁচ টাকা হেড পণ্ডিত পান নয় টাকা।

সারাদিন হাঁটিয়া আবার ফিরিলাম পলাশপুরে। সন্ধ্যা হইয়া গেল ফিরিতে। শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত, পা টন্ টন্ করিতেছে। মুজিবর জিজ্ঞাসা করিল—কি হল ডাক্তারবাবু? তাহাকে সব বলিলাম, তারপর নিজের অন্ধকার খড়ের ঘরে ঢুকিয়া ভাঙা লণ্ঠনটা জ্বালিলাম। নদীর ঘাট হইতে হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া মাদুরটা বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম। ক্ষুধা খুবই পাইয়াছিল, কিন্তু উঠিয়া রাঁধিবার উৎসাহ মোটেই ছিল না। গোটাকতক আম খাইয়া রাত্রি কাটিল।

অন্ধকারে শুইয়া শুইয়া কত কথা ভাবি। একা একা কাটাইতে হয়, কথা বলিবার মানুষ পাই না, এই হইয়াছে সকলের চেয়ে কষ্ট। ইচ্ছা হয় স্ত্রীকে আনিয়া কাছে রাখিতে। কতকাল তাহাকে দেখি নাই, তাহার একটু সেবা পাইতে সাধ হয়। এই সারাদিন খাটিয়া খুটিয়া আসিলাম, ইচ্ছা হয় কাছে বসিয়া একটু গল্প করুক, দুঃখ-

কষ্টের মধ্যেও সুখে থাকিব। কিন্তু আনি কোথা হইতে ? খাওয়াই কি ?

হাটতলায় কি ভীষণ অন্ধকার। মাত্র দুখানি দোকান, তাও দোকানীরা বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। চারিদিকে বড় বড় গাছপালার অন্ধকারে জোনাকী জ্বলিতেছে, বিলাতী আম্‌ড়াগাছটায় বাদুড়ে ডানা ঝট্‌পট্‌ করিতেছে।

গভীর রাত্রি হইয়াছে, কিন্তু গরমে ঘুম আসে না চোখে। কি বিশ্রী গুমোট ! সারারাত্রি টুব্‌টাব্‌ শব্দে পাকা আম পড়িতেছে চারিদিকের আমবাগানে, শুইয়া শুইয়া শুনিতেছি।

উঃ, কি একঘেয়েই হইয়া উঠিয়াছে এখানকার জীবন, সকালে উঠিয়া নদীর ধারে একটু বেড়াইয়া আসিয়া সেই হাটতলায় ফিরিয়া আসি, বেশীদূর কোথাও বেড়াইতে যাইতে পারিনা, কি জানি রোগী আসিয়া যদি ফিরিয়া যায় ? সারাদিন ডিসপেন্‌সারি আগলাইয়া বসিয়া থাকিতে হয় আশায় আশায় !

মুদি পোড়া আঁখি বসি রসালের তলে
ভ্রান্তিমদে মাতি ভাবি পাইব
পাদপদ্ম। কাঁপে হিয়া দুরু দুরু করি—

আর তা ছাড়া যাই বা কোথায় ? চাষা গাঁ, কোন ভদ্রলোকের বাড়ী নাই যে বসিয়া একটু গল্প-গুজব করি। ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই আমার ফুটা খড়ের ঘরের ডিস্‌পেন্সারী আর মুজিবরের দোকান, দোকান্‌ আর ডিস্‌পেন্সারী। কোন কোন দিন সন্ধ্যার দিকে পিপলিপাড়ার বিলের ধারে বেড়াইতে গিয়া দেখি বাগ্দীরা কি করিয়া ডোঙ্গায় উঠিয়া কোঁচ ছুঁড়িয়া কই মাছ মারিতেছে। অন্ধকার দেখিয়া দুটা হয় তো শাক তুলিয়াও আনি কোন কোন দিন। একঘেয়ে আম-ভাতে ভাত অখণ্ড প্রতাপে রাজ্য চালাইতেছে তো বৈশাখ মাস হইতেই—কতদিন আর ভাল লাগে ?

আমার নামের কপাল নয়। কাল ও পাড়ার বিষ্ণু কলুর বড় ছেলেকে সন্ধ্যার পরে ঘানি-ঘরের দরজায় সাপে কামড়াইল, আমি শুনিয়াই ছুটিয়া গেলাম, আমায় কেহ ডাকিতে আসে নাই বটে, কিন্তু কানে শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারি কি করিয়া? গিয়াই শক্ত করিয়া গোটাকতক বাঁধন দিলাম, দষ্টস্থান চিরিয়া পটাস্ পারম্যাঙ্গানেট টিপিয়া দিলাম—এমন সময় পাড়ার লোকে ওঝা ডাকিয়া আনিল। ওঝা আসিয়াই আমার বাঁধন খুলিয়া ফেলিতে হুকুম দিল। আমার নিষেধ কেহই গ্রাহ্য করিল না। বাঁধন খুলিয়া ঝাড়-ফুঁক করিতে করিতে রোগী সারিয়া উঠিল। ঝাড়-ফুঁক সব বাজে, আমার বাঁধনে আর পটাস্ পারম্যাঙ্গেনেটে কাজ হইয়াছিল—নাম হইল সেই ওঝার। যাক্, সেই জন্য আমি দুঃখিত নয়, একজনের জীবন বাঁচিয়া গেল, এই আমার যথেষ্ট পুরস্কার।

না খাওয়ার কষ্টও সহ্য করিতে পারি। একঘেয়ে জীবনের কষ্টে একেবারে মারা যাইতে বসিয়াছি। তবুও বসিয়া বসিয়া দিবা-স্বপ্নে কাটাইয়া মনের কষ্ট মন হইতে তাড়াই।

টাকা পয়সা হাতে হইলে কি করিব বসিয়া বসিয়া তাহাও ভাবি।

সুবাসিনীকে লইয়া আসিব, খোকাকে লইয়া আসিব। নদীর ধারে মুজিবর জমি দিতে চাহিয়াছে, সেখানে দুখানা খড়ের ঘর তুলিব আপাততঃ। বাড়ীর চারিধারে ছোট একখানা ফুল বাগান করিব, সন্ধ্যা বেলা আধফুটন্ত বেলকুঁড়ি এই গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় রেকাবি করিয়া তুলিয়া আনিয়া কিছু ঘরে কিছু সুবাসিনীর খোঁপায় পরাইয়া দিব। এখানকার তহশিলদারকে বলিয়া কিছু ধানের জমি লইয়া চাষবাস করিব, ঘরে ধান হইলে স্বচ্ছলতা আপনিই দেখা দিবে।

ভাদ্র মাসে একদিন ডিস্পেন্সারি ঘরে বসিয়া আছি, দেখি যে

একটি মেয়ে হাটতলার বনের মধ্যে জামতলায় কি খুঁজিয়া বেড়াই-তেছে। আমায় দেখিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

বলিলাম—কি খুঁজছ ওখানে খুকী?

মেয়েটি লাজুক সুরে বলিল—ঘেঁটকোলের ডগা—

—কি হবে ঘেঁটকোলের ডগা?

—ঘেঁটকোলের ডগা তো খায়—

কথাটা জানিতাম না। ঘেঁটকোলের ডগা যদি খাওয়া যায়, তবে তো আমার তরকারী কিনিবার সমস্যা ঘুচিয়া যায়। হাটতলার চারি-দিকের বনে-জঙ্গলেই দেখিতেছি বহু ঘেঁটকোল আছে! কিন্তু গাছটি চিনিতাম না, নাম শুনিয়া আসিয়াছি বটে।

বলিলাম—কৈ, কি রকম গাছ দেখি?

মেয়েটি বলিল—এই দেখুন, কচুগাছের মত দেখতে। কিন্তু একটা পাতা তিনটে ভাঁজ করা—

—কি করে খায়?

—যেমন ইচ্ছে। ছেঁচ্‌কি করে খায়, চচ্চড়ি করেও খায়। খাবেন, দেব তুলে?

মেয়েটির কাছে একটু চাল দেখাইলাম। ডাক্তারবাবু হইয়া বুনো ঘেঁটকোলের ডগা কি করিয়া খাইব, তবে যদি নিতান্তই খাইতে হয়, সে এই অবজ্ঞাত বন্য উদ্ভিদের প্রতি নিতান্ত কৃপা করিয়াই খাইব,—এই ভাবটা দেখাইবার চেষ্টা করিলাম।

বলিলাম—ও সব কচু-ঘেচুর ডগা কে রাঁধবে? কি করে রাঁধতে হয়?

মেয়েটি শিখাইয়া দিল, ঘেঁটকোলের ডগার ছেঁচকি রাঁধিবার প্রণালী, এক আঁটি ডগা তুলিয়া দিয়াও গেল।

যাইবার সময় আমার রান্নাঘরের দিকে চাহিয়া বলিল—এখানে কে থাকে ?

—আমিই থাকি।

—সে কথা নয়, আপনার সঙ্গে থাকে কে ? রেঁধেবেড়ে দেয় কে ?

—কেউ না, নিজেই।

সেই হইতে মেয়েটি আমায় কেমন একটু কৃপার চক্ষে দেখিল বোধ হয়। যখনই সে হাটতলায় ঘেঁটকোলের ডগা সংগ্রহ করিতে আসিত—আমায় এক আঁটি দিয়া যাইত।

সকালের দিকেও আসিত, আবার বৈকালেও আসিত। একদিন বৈকালে আপন মনে বসিয়া আছি, মেয়েটি আসিয়া দাওয়ার ধারে কোঁচড থেকে কিছু ডুমুর বাহির করিয়া রাখিয়া বলিল—এ বেলা হরে কলুদের পুকুরপাড় থেকে ডুমুর পেড়েছিলাম, তাই আপনাকে দুটো দিয়ে যাচ্ছি।

মেয়েটি কে তা আমি কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই। মেয়েটি দেখিতে ভাল, বেশ বড় বড় চোখ, বয়েস আঠারো উনিশ হইবে। গায়ের রং যতটা ফর্সা, এ সব পাড়াগাঁয়ে তত সুন্দর গায়ের রং প্রায়ই দেখা যায় না। তবে ব্রাহ্মণ কায়স্থের ঘরের মেয়ে নয় দেখিলেই বোঝা যায়। সেদিন তাহার পরিচয় লইয়া জানিলাম সে সেই গ্রামেরই বিধু গোয়ালিনীর মেয়ে, তার ভাল নাম সম্ভবতঃ প্রেমলতা বা ঐ রকম কিছু, সবাই 'প্রেমো' বলিয়া ডাকে। অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছে, যেমন সাধারণতঃ আমাদের দেশে গোয়ালার ঘরে হয়।

মেয়েটি কিছুক্ষণ চালের বাতা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বলিল—আপনার বিয়ে হয় নি ?

—কেন হবে না ?

—তবে বৌকে নিয়ে আসেন না কেন? এখানে তো আপনার রান্নাবান্নার খুব কষ্ট।

—হাঁ, তা বটে। এইবার আনব ভাবছি।

—মা বাবা আছেন?

—নাঃ।

—কোথায় আপনার বাড়ী?

—সে তুমি চিনতে পারবে না, সে অনেক দূর।

এইভাবে আলাপের সূত্রপাত। তার পর কতদিন সকালে বিকালে প্রমো আসিত কোন দিন ওলের ডাঁটা, কোন দিন ডুমুর, কোনো দিন বা একটা চালতা, নিজে যা বনে জঙ্গলে সংগ্রহ করিত, তার কিছু ভাগ আমায় না দিয়া তার যেন তৃপ্তি হইত না। মাঝে মাঝে ওইখানটায় দাঁড়াইয়া চালের বাতা ধরিয়া কত গল্প করিত। সরলা বালিকা কাঠ কুড়াইয়া, শাকপাতা সংগ্রহ করিয়া তার দরিদ্র মায়ের গৃহস্থালীর অভাব দূর করিতে যেমন চেষ্টা করিত, তেমনই এই দরিদ্র ডাক্তারের প্রতি গভীর অনুকম্পা বশতঃ তার ভাতের থালার উপকরণও জুটাইয়া দিত। বড় ভাল লাগিত তাকে। একটা অদৃশ্য সহানুভূতির সূত্রে সে আমাকে বাঁধিয়াছিল এবং বোধ হয় আমিও তাকে বাঁধিয়াছিলাম। পলাশপুরের হাটতলার নিঃসঙ্গ জীবনে একটি মমতাময়ী নারীর সঙ্গে বোধ হয় খুব ভালই লাগিয়াছিল। তাই সে আসিলে মনটা খুসী হইয়া উঠিত। ইদানীং সে আসিতও ঘন ঘন, নানা ছলছুতায়, কারণে অকারণে। আসিয়া থেইহারা কথাবার্ত্তায় থাকিয়া যাইতও অনেকক্ষণ।

একদিন লক্ষ্য করিলাম, প্রমো তার বেশভূষার দিকে নজর দিয়াছে। প্রথম সেদিন তার যত্ন করিয়া বাঁধা খোঁপাটির দিকে চাহিয়া আমার এ কথা মনে হইল। ফর্সা শাড়ীখানা পরিপাটি করিয়া পরিতে শিখিয়াছে। মুখের হাসির মধ্যে একদিন সলজ্জ সঙ্কোচের ভাব দেখিলাম, যে

ধরণের হাসি তার মুখে নতুন। আর কত ভাবেই সেবা করিতে সে চেষ্টা করিত, শাক তুলিয়া, তরকারী কুটিয়া দিয়া। আগে আগে আসিয়া চালের বাতা ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, ইদানীং দাওয়ার কোণে ওইখানটায় বসিত। তার মুখের ভাব দিন দিন যেন আরও সুশ্রী হইয়া উঠিতেছিল।

পলাশপুরে তো কত লোক আছে, হাটতলায় তো কত লোক যাতায়াত করে, এই দরিদ্র ডাক্তারের নিঃসঙ্গ জীবনের প্রতি কেহই তো অমন দরদ দেখায় নাই—তাই বলি পুরুষমানুষের মেয়েমানুষের মত বন্ধু কোথায় ?

গত ফাল্গুন মাসে উপরি উপরি কয়েকদিন সে আসিল না। মনটা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। এমন তো কখনও হয় না। দু তিন দিন পরে কানে গেল বিধু গোয়ালিনীর মেয়ের টাইফয়েড হইয়াছে। কেহ ডাকিতে না আসিলেও দেখিতে গেলাম। দেখিয়া শুনিয়া বুঝিলাম, এ বয়সে টাইফয়েড, শিবের অসাধ্য রোগ। প্রাণপণে চিকিৎসা করিতে লাগিলাম—উহারা সাতদিন পরে আমার উপরে আস্থা হারাইয়া ডাকিল ইন্দু ডাক্তারকে। আমাকে রোগশয্যার পাশে দেখিয়া প্রমোর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল প্রথম দিন। শুনিলাম ইন্দু ডাক্তার যে দিন দেখিতে আসিয়াছিল, সে দিন সে ইন্দু ডাক্তারের ঔষধ খাইতে চায় নাই। মরণের ছয় সাত দিন পূর্ব্ব হইতে সে অজ্ঞান অবস্থায় ছিল।

আজ কয়েক মাস হইল আমি আবার যে একা, সেই একা। কে আর আমার জন্য শাক, ডুমুর, ঘেঁটকোলের ডগা তুলিয়া দিবে, এখন আবার সেই আম-ভাতে ভাত !

বর্ষা নামিয়া গিয়াছে। রাস্তাঘাটে বেজায় কাদা, মশার উৎপাত বাড়িয়াছে। হাটতলার চারিপাশের বাগানের বড় বড় গাছের মাথায়

সারাদিন ধরিয়া মেঘ জমিতেছে, ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়িয়া আকাশ একটু-খানি ফরসা হইতেছে···আবার মেঘ উড়িয়া আসিতেছে, আবার বৃষ্টি। জলে ভিজিয়া গাছের গুঁড়িগুলির রং আবলুসের মত কালো দেখাইতেছে!

চুপ করিয়া বসিয়া থাকি। মনে হয় কারাগারে আবদ্ধ হইয়া আছি। যখন নিতান্ত অসহ্য হয়, মুজিবরের দোকানে গিয়া বসি। নীচু চালাঘরের দোকান, রেড়ির তেল, কেরোসিন তেল, জিরেমরিচ, খড়িমাটী, কড়া তামাক, আলকাতরা পচা সর্ষের তেল, সবে মিলিয়া কেমন একটা গন্ধ ঘরটায়। গন্ধটায় মন হু হু করে, মনে হয় এ কোথায় পাড়াগাঁয়ে পড়িয়া আছি! কবে বেড়াজালের নাগপাশ হইতে মুক্তি পাইব? আদৌ মুক্তি পাইব কি না তাই বা কে জানে? জীবনটা যেন কেমন ধারা হইয়া গেল। তবুও যদি—এত কষ্টেও এই একঘেয়ে অজ পাড়াগাঁয়েও, আমার মনে হয়, সব কষ্ট সহ্য করিতে পারিতাম, যদি সুবাসিনী ও খোকা কাছে থাকিত।

একবার যখন কলিকাতায় থাকিতাম, ভবানীপুর দিয়া আসিতেছি, দেখি একটা বড় বাড়ী হইতে দলে দলে মেয়েরা বই হাতে করিয়া বাহির হইতেছে। নানা বয়সের মেয়ে আছে তার মধ্যে।

ভাবিলাম—ই কি? এত মেয়ে আসে কোথা হইতে? ব্যাপার কি একবার দেখিতে হইতেছে তো!

তারপর জানিলাম—সেটা একটা মেয়েদের কলেজ।

কি চমৎকার সব মেয়ে ছিল তার মধ্যে। কেমন সব পরণে, কেমন চশমা, কি রূপ! আর একবার দেবেন্দ্র ঘোষ ষ্ট্রীট দিয়া যাইতে-ছিলাম, একটি বড়লোকের বাড়ীর দোতলায় কোন এক মেয়ে গান গাহিতেছিল, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিলাম। অমন সুন্দর গান তারপর

আর কখনও শুনি নাই। কোথায়ই বা শুনিব? গানের কয়েকটি লাইন এখনও মনে আছে।

প্রিয় তুমি আস নাই আজ ভোরে
মধুমালতীর নয়নে শিশির দোলে।

সে সব গান আমাদের মত মাটির মানুষের জন্যে নয়।

সারাদিন ঝম্ ঝম্ বৃষ্টির পরে সন্ধ্যার সময়টা একটু বাদল থামিয়াছে। গাছপালার অন্ধকারের সঙ্গে আকাশের অন্ধকার মিলিয়া হাটতলা যেমন নির্জ্জন, তেমনই অন্ধকার। ডোবার জলে মনের আনন্দে ব্যাঙ ডাকিতেছে, প্রেমো যেখানে ঘেঁটকোলের ডগা তুলিয়া বেড়াইত, সেই সব বনে ঝিঁ ঝিঁ পোকার দল একঘেয়ে ডাক জুড়িয়া দিয়াছে। জাম গাছের উঁচু ডালটা হইতে দমকা হাওয়ায় ছড় ছড় করিয়া পাকা জাম বনের মধ্যে অন্ধকারে জলে ভেজা শেওড়াবনের মাথায় পড়িতেছে।

নির্জ্জন সন্ধ্যায় একা বসিয়া ভাবি······

পুরোণো কথা

বাল্যে সর্ব্বদাই দেখতুম, বাবার সঙ্গে ঠাকুরমার ঝগড়াবিবাদ চলেছে।

এর কারণ কিছু বুঝতুম না, আমার বয়স তখন সাত বছর। ঠাকুরমা যে বাবার মা এটা অনেকদিনই বুঝেছিলুম, কিন্তু মা ছেলেকে অমনই ক'রে যে দিন নেই রাত নেই বকে, তার কোনো নজীর আমার নিজের মায়ের সঙ্গে আমার সম্বন্ধে খুঁজে পাই নি।

বুড়ো মানুষেই যে অমনই করে, তাও তো নয়; কারণ আমার দিদিমা ছিলেন ঠাকুরমার চেয়েও বেশী বয়সের। দিদিমার মাথার চুল পেকেছিল, ঠাকুরমার মাথার চুল তখনও অনেক কাঁচা। কিন্তু কই দিদিমা তো আমায় খুব ভালবাসতেন, কাউকে তো কখনও বকতে শুনি নি তাঁর মুখে! তবে কেন ঠাকুরমা এরকম করেন আমার বাবাকে? মাঝে মাঝে একথা ভেবেছি। কিন্তু সাত বছরের ছেলে, ভেবে কিছু ঠিক করতে পারতুম না, বা বেশিক্ষণ এসব কথা আমার মনে দাঁড়াতও না।

দিদিমার কাছে আমি অনেক সময় থাকতুম। তাঁর বাড়ী আমাদের গ্রাম থেকে নৌকায় যেতে হয়। অনেকখানি সময় লাগত সেখানে পৌঁছতে। সকালে খেয়ে বার হ'লে সেখানে পৌঁছাবার আগে রোদ ঝাঙা হয়ে আসত; বাদুড়ের দল ডানা ঝটপট ক'রে আকাশ দিয়ে

উড়ে বাসায় যেত, নদীর জলে নৌকার ধারে ভুসভুস ক'রে শুশুকেরা ডিগবাজি খেয়ে ডুব দিত।

এসব অনেক ছেলেবেলাকার কথা। তখন আমরা থাকতাম আমাদের দেশের বাড়িতে। সেখান থেকে অনেকদিন আমরা চ'লে এসেছিলুম, আর কখনও যাই নি। দেশে এখন আর আমাদের বাড়িঘর নেই, ম্যালেরিয়ায় জনহীন শ্রীহীন হয়ে গিয়েছে শুনেছি। বহুদিন কলকাতার বাসিন্দা, এখন সেসব জায়গায় যেতে ভয় করে, বিশেষ ক'রে এখন যখন বয়স হয়েছে, সাবধানে থাকাই ভাল।

দেশের বাড়ির সঙ্গে মায়ের স্মৃতি জড়ানো। যখনই দেশের বাড়ির ডালিম গাছটা, তার পাশে লম্বা পেঁপে গাছটা, তার পাশে পুরোনো পাতকুয়ো ও গোয়ালঘরটার ছবি মনে আসে, সঙ্গে সঙ্গে অমনই মনে আসে আমার মায়ের খুব অস্পষ্ট একটি ছবি। ওদের সঙ্গে মা যেন জড়ানো আছেন।

কি ভালই বাসতুম মাকে! জীবনে অত ভাল কাউকে বাসিনি, বাসতে পারবও না।

মায়ের সম্বন্ধে আমার অতি শৈশবকালের যে ছবিটি জাগে, তাতেও দেখি ঠাকুরমা মাকে অনেক কষ্ট দিতেন, মাকে শক্ত কথা বলতেন অকারণে। ছেলেমানুষ হ'লেও আমি তা বুঝতুম; বুদ্ধি দিয়ে না বুঝলেও শিশুর 'ইন্সটিংক্ট' দিয়ে বুঝতুম; তার একটা মস্ত কারণ, মার প্রতি ছিল আমার গভীর দরদ ও সহানুভূতি, একই রক্ত একই মাংস আমার গায়ে। আমার চেয়ে মায়ের দুঃখ বুঝবে কে?

একদিনের কথা আমার মনে হয় অস্পষ্ট একখানা ছবির মত।

আমাদের বাড়ির সদর দরজার সামনে কিছু দূরে আর একজন কাদের বাড়ি ছিল। একটা খুব বড় ঝাঁকড়া লিচু গাছ ছিল তাদের

বাড়ির বাইরের উঠানে। বিকেলবেলাটায় আমি ও আরও অনেক ছেলে লিচুতলায় খেলছিলুম।

এমন সময়ে আমাদের বাড়ির সদর দরজায় দাঁড়িয়ে মা ডাক দিলেন, ভানু খাবার খাবি আয়।

খেলা ফেলে ছুটে গেলুম খেতে।

সদর দরজার ফ্রেমে মার ছবিটা আজও বেশ মনে হয়। দুদিকের কাঠে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছেন, পরণে সাদা শাড়ি, মুখে হাসি। দরজার কবাট জোড়া সেকেলে ধরণের মোটা মোটা পেরেকের গুল-বসানো। পাশেই ছোট একটি চালাঘরে খড়-বিচালি থাকত।

মা খেতে দিলেন মুড়ি মেখে। বেতের ছোট্ট ধামিতে মুড়ি নিয়ে খেতে বসেছি, এমন সময় নদীর ঘাট থেকে ঠাকুরমা ফিরলেন জল নিয়ে, এবং আমার হাতে মুড়ির ধামি দেখেই মাকে বকুনি ও গালাগালি সুরু করলেন।

ঠিক কথাগুলো মনে নেই, কিন্তু তার মোট মর্ম্ম এই যে, বাড়ীতে ওবেলা পুরুতঠাকুরের নিমন্ত্রণ ছিল একাদশী ব'লে, তিনি রুটি খেয়েছিলেন, তাঁর পাতে রুটি তরকারি রয়েছে। সেই পাতের রুটি তরকারি আমার জন্যেই ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়েছেন ঠাকুরমা। ঘাট থেকে আসতেও এমন কিছু দেরী হবে না, তখন এরই মধ্যে মুড়ির ঘড়া পেড়ে ছেলেকে সোহাগ ক'রে মুড়ি খেতে দেওয়ার মানে কি?

আমায় বললেন, রাখ মুড়ি, পাঁচ-ছখানা রুটি প'ড়ে রয়েছে পাতে, ওগুলো উঠবে কি ক'রে?

পরের পাতের ঘাঁটা জিনিস খেতে আমার ঘেন্না করে। কিন্তু ঠাকুরমার ভয়ে কিছু বলতে পারলুম না। ঠাকুরমা ঢাকা খুলে পাতের খাবার আমায় খেতে দিলেন। খাবার সময়েই আমার কান্না এল মায়ের কথা ভেবে। মিথ্যে মিথ্যে ঠাকুরমা মাকে বকলেন কেন?

মা হয়তো জানত না পাতের খাবার ঢাকা আছে। ভাবলুম, মায়ের প্রতি এমন একটা কিছু দেখাব, যাতে মায়ের মনের কষ্ট দূর হয় কিন্তু চার বছর তখন আমার বয়স, না পারি কথা গুছিয়ে বলতে না পারি কিছু বোঝাতে। হয়তো খুব শক্ত ক'রে মায়ের গলা জড়িয়ে রাত্রে শুয়েছিলুম, এ ছাড়া সহানুভূতি দেখানোর অন্য কোন উপায় আমার জানা ছিল না সে বয়সে।

মধ্যে কিছুদিনের কথা আমার তত মনে পড়ে না, আবার যখন মায়ের কথা মনে পড়ে তখন মার খুব অসুখ। কি অসুখ জানতুম না তখন। নীচের একটা ঘরে মা থাকতেন, আমাকে মার কাছে যেতে সবাই বারণ ক'রে দিয়েছিল। কিন্তু আমাকে ধ'রে রাখা সোজা কথা নয়, ফাঁক পেলেই আমি মার ঘরে ঢুকতুম, খানিকক্ষণ ধ'রে মার সঙ্গে কি সব কথা কইতুম। তারপর সন্ধান পেয়ে ওরা এসে ধ'রে নিয়ে যেত। ঠাকুরমার কাছে বকুনি খেতে হ'ত ওঘরে যাওয়ার জন্যে।

এ রকম চলল দু দশ দিন নয়, অনেক—অনেকদিন, কতদিন তা আমার জানবার বয়স হয় নি। মোটের ওপর অনেক দিন। এখন মনে হয় সাত আট মাসের কম নয়।

একদিন শুনলুম, মায়ের অসুখ নিয়ে বাবার সঙ্গে ঠাকুরমার ঝগড়া হচ্ছে।

ঠাকুরমা বলছেন, আর ওর পেছনে পয়সা খরচ ক'রে কি হবে? আমার ছেলেমেয়েগুলো কি পথে দাঁড়াবে? সংসারের টাকা দিয়ে দামী দামী ওষুধ এল কত এই ক-মাসে, তাতে কিছু যখন হ'ল না, তখন আর আমি বেশি টাকা খরচ করতে দেব না।

বাবা বলছেন, তা ব'লে একটা মানুষ বিনা চিকিৎসায় মরবে চোখের সামনে?

ঠাকুরমা বললেন, চিকিচ্ছে কম হয় নি কিছু। এখনও তো

চিকিচ্ছের ক্রটি নেই, কিন্তু আর আমি তোমায় টাকা দোব না। যে বাঁচবে না, তার পেছনে আর কেন টাকা খরচ ?

সেদিন বুঝলুম, মার অসুখ খুব গুরুতর। মন খুব খারাপ হয়ে গেল, সমস্ত বাড়ীর মধ্যে আমার মন টানে কেবল মায়ের ঘরে। যখন মন খারাপ হয়, মার কাছে গেলে সব দুঃখ চ'লে যায়। কিন্তু সেখানে যখন তখন যাবার যো নেই। লুকিয়ে যেতে হবে, নইলে ঠাকুরমাকে পিসীমা ব'লে দেবেন। ছোটপিসীমা আমায় কোলে ক'রে পুকুরধারে নিয়ে যাবে চ'লে। ওদের সঙ্গে আমি তো জোরে পারি না!

পুকুরধারে বড় চাঁপাফুলের গাছ আছে। তার তলায় ছোটপিসীমা আমায় নিয়ে গিয়ে বলত, ওরকম যেও না যখন তখন ও ঘরে; যেতে নেই। এখানে ব'স।

মা ভিন্ন সংসারটা আমার কাছে ফাঁকা। মা ছাড়া আর কিছু বুঝি না, আর কাউকে ভাল লাগে না—কেবল দিদিমা ছাড়া। দিদিমা নিতান্ত গরীব, আমার মা তাঁর একমাত্র মেয়ে। মাঝে মাঝে তিনি যখন এসে আমাদের বাড়ী থাকতেন, রান্নাঘরের কাজকর্ম্ম নিয়ে তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হ'ত সদাসর্ব্বদা। তিনি যেন এসে হতেন আমাদের বাড়ীর রাঁধুনী। মায়ের অসুখের সময় তিনি এসেছিলেন, এবং রোগীর সেবা করবার জন্য তিনি ছাড়া আর লোক ছিল না।

মায়ের খাওয়ার আলাদা একখানা থালা, গেলাস ও বাটি ছিল। দিদিমা থালা বাটি রান্নাঘরের দাওয়ায় পেতে দাঁড়িয়ে থাকতেন মায়ের ভাতের জন্যে। মায়ের ঘরে থাকতেন ব'লেই বোধ হয় ইদানীং তাঁকেও আমাদের ঘরে-দোরে উঠতে দেওয়া হ'ত না।

মায়ের ঘরে দিদিমা যা কিছু করবার সব করতেন, এ জন্য তাঁকে কেউ ছুঁতো না, তিনি ভাত খেতেন রান্না ঘরের দাওয়ায় ব'সে, নয়তো

উঠানের পেয়ারা-তলায় ব'সে। তিনি থাকতেন এ বাড়ীতে চোর হয়ে। মায়ের অসুখের কি ওষুধপত্র নিয়ে কথা বলতে যেতে ঠাকুরমার কাছে তাঁকে কতবার বকুনি খেতে হয়েছে।

ঠাকুরমা বলতেন অত যদি দরদ মেয়ের ওপর, নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে চিকিচ্ছে-পত্তর করাও গে। জামাইকে তো দিনরাত জপাচ্ছ, হুগলী থেকে ডাক্তার আনতে, পয়সা দেবে কে? তোমার কি? একটা মোটে মেয়ে, সস্তায় ঝেড়ে ফেলে দিয়েছ। আমার এখনও আইবুড়ো মেয়ে ঘরে, তোমার মেয়ের জন্যে তাকে ত আমি জলে ভাসিয়ে দিতে পারি না? যে ক'টা টাকা আছে, তা এখন তুলে রেখে দিতে হবে ওর ঘর-বর দেখে দিতে; এতে তোমার মেয়ের ভাগ্যে বাপু, যা থাকে।

দিদিমাকে কতদিন পুকুরঘাটের চাঁপাতলায় ব'সে একা হাপুস-নয়নে কাঁদতে দেখে'ছি। এ রকম কতদিন যে কাটল! কতদিন যে মায়ের ঘরে যেতে পারলুম না! মা দিন দিন যেন বিছানার সঙ্গে মিশে যেতে লাগলেন। মায়ের ঘরের দোর সর্ব্বদাই বন্ধ। আমি জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতুম, মা একা ঘরের মধ্যে বিছানায় অঘোর হয়ে অচৈতন্য হয়ে শুয়ে। দিদিমা হয়তো মায়ের ছাড়া কাপড় নিয়ে কাচতে গিয়েছেন।

আমি আস্তে আস্তে ডাকতুম, ও মা, মা! তারপর দোর ঠেলে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করতুম। অমনই ছোটপিসিমা কোথা থেকে এসে আমায় ছোঁ মেরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেন।

— বাবা কি দস্যি ছেলে! এক দণ্ড যদি চোখের আড় করবার যো আছে! ঘুরছেন সর্ব্বদা মার কাছে যাবার জন্যে। বারণ ক'রে দিইছি না তোমায়?

ঠাকুরমা চেঁচিয়ে ব'লে উঠতেন, দে আচ্ছা ক'রে দু ঘা কষিয়ে।

পরের হোলা খায় বন পানে ধায়; যতই কর, ছেলের সর্ব্বদাই মা, মা, আর মা!

বড়পিসিমা মাকে সত্যিকার ভালবাসতেন। তাঁর বিয়ে হয়েছিল এই গাঁয়েই। পিসেমশায়ের অবস্থা বোধ হয় ভাল ছিল না, বড়পিসিমাকে ভাল কাপড়-চোপড় পরতে দেখিনি কোনও দিন। ঠাকুরমার সঙ্গেও বোধ হয় তাঁর তেমন ভাব ছিল না। তিনি কিন্তু মাঝে মাঝে এসে মায়ের কাছে ব'সে থাকতেন, দিদিমা বাদে তিনি আর বাবা ছাড়া মায়ের ঘরে আর কেউ ঢুকত না।

বাবার কোন কথা বলবার যো ছিল না। মায়ের অসুখের সম্বন্ধে কিছু বললেই ঠাকুরমার সঙ্গে ঝগড়া বেধে যেত। একদিন সকালে উঠেই শুনলুম ঠাকুরমাতে আর বাবাতে তুমুল তর্ক চলছে।

ঠাকুরমা বলছেন, চান্দ্রায়ণ প্রাচিত্তির না করলে আমার বাড়িতে অকল্যেণ হবে। তোমার বউ তো একা নয়, আমার আরও লোকজন নিয়ে ঘরকন্না করতে হয়। পুরুত-ঠাকুর ব'লে গিয়েছেন, প্রাচিত্তির করাতে হবে এই একাদশীর দিন।

বাবা বলছেন, বল কি মা? ও কালও বলেছে, হ্যাঁগা আমি বাঁচব তো? আমি বলেছি, কেন বাঁচবে না? এবার ডাক্তার বলেছে সেরে উঠবে। চান্দ্রায়ণের নাম শুনলেই ও ভয়ে খুন হয়ে যাবে। যার এখনও এত বাঁচবার ইচ্ছে, তাকে কি ক'রে প্রাচিত্তির করানো যায় মা? ও তা হ'লে ভয়ে ম'রে যাবে।

ঠাকুরমা বললেন, আর এমনই যেন বাঁচবে! দুদিন আগে আর দুদিন পাছে। তোর লজ্জা করে না বোয়ের কথা বলতে আমার সামনে? মুখের লাগাম আলগা ক'রে দিয়েছ যে একেবারে! এককড়ার মুরোদ নেই, আবার কথাবার্ত্তা শোন গুণধর ছেলের?

সোজা কথা ব'লে দিচ্ছি, প্রাচিত্তির না হ'লে ওই রোগের মড়া কেউ বার করতে আসবে ঘর থেকে ?

বাবা বললেন, চুপ চুপ, শুনতে পাবে ও ঘর থেকে। আচ্ছা মা, তোমার কি একটু দয়াও হয় না! ও মরণের নামে ভয়ে কালি হয়ে যাচ্ছে, দুবেলা একে ওকে বলছে, আমি বাঁচব তো ? আর তুমি কি ব'লে ওর কানের কাছে—

এর উত্তরে ঠাকুরমা চীৎকার ক'রে বিপরীত কাণ্ড বাধিয়ে তুললেন।

যাই হোক, বাবার কোনও কথা বোধ হয় খাটল না, কারণ একদিন মায়ের ঘরে কি সব পূজো-আচ্চার জোগাড় হ'ল, পুরুতঠাকুর এলেন ওপাড়া থেকে। তিনি কালীর বাবা, আমি তাঁকে চিনি, কালী আমাদের সঙ্গে খিড়কী বাগানে কত খেলা করেছে, ভারি ছুটতে পারে, তার সঙ্গে ছুটে কেউ পারি না আমরা। সে এখন এখানে নেই, তার মামার বাড়িতে গিয়েছে।

বড়পিসিমা বলছিলেন হরি গয়লানীর কাছে, সে আমাদের দুধ যোগান দেয়।

আহা, বলছি পুরুত আসছেন, তোমার একটা স্বস্ত্যেন করতে হবে কিনা; বউয়ের মুখ ভয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছে। বলছে, কেন ঠাকুরঝি, তবে কি আমি বাঁচব না ? তখন আবার বোঝাই, বলি, তা কেন, স্বস্ত্যেন করলে তোমার অসুখ সারবে, ভয় কি ? আহা, ছেলেমানুষ, এই সবে বাইশ বছরে পা দিয়েছে; ওর এখনও কত সাধ জীবনে, বাঁচবার কি ইচ্ছে পোড়াকপালীর !

দিন দশ বারো পরের কথা।

পাশেই এপাড়ায় সন্তুদের বাড়ি। সন্তুর দাদা বিয়ে ক'রে নতুন বউ এনেছে। তাদের বাড়ীতে সবাই গিয়েছে বউ দেখতে। খুব

বাজ-বাজনা ক'রে বিয়ে করতে গিয়েছিল সন্তুর দাদা। এক একটা হাউইবাজি যেন গিয়ে একেবারে আকাশে ঠেকে।

বাড়ির সবাই গিয়েছে। দিদিমা যান নি, রাত জাগেন ব'লে তিনি ও-বারান্দায় আঁচল পেতে ঘুমোচ্ছেন।

আমি চুপিচুপি মায়ের ঘরে ঢুকে, মায়ের কাছে গিয়ে বসলুম। মায়ের কাছে আসবার লোভেই বউ দেখতে যাইনি, বাগানে গিয়ে লুকিয়ে ছিলুম; নইলে ছোটপিসিমা অনেক ডাকাডাকি করেছিল।

মা বেশি কথা বলতে পারেন না। আমি চুপ ক'রে মায়ের বিছানায় শিয়রের পাশটিতে ব'সে আছি। বেলা বেশি নেই। পুকুর-ধারের চাঁপা গাছে রোদ রাঙা হয়ে এসেছে।

খানিকটা পরে মা বললেন, খোকা, আমি যদি মরে যাই, তুই কি করবি?

আমি কিছু বললুম না, চুপ ক'রে রইলুম। আমার মনে একটা অদ্ভুত ধরণের বিষাদ।

আর কখনও এ ধরণের ভাব আমার মনে হয় নি। ভয়ানক মন কেমন করছে কার জন্যে; কার জন্যে যে বুঝতেও পারি না।

মা যেন আপন মনেই বলছিলেন, খোকা, তোকে যে কার কাছে রেখে যাব সেই হয়েছে আমার ভাবনা। কেই বা তোকে বুঝবে!

হঠাৎ মা তাঁর হাতের আংটিটা খুলে আমায় দিয়ে বললেন, যা, এটা লুকিয়ে রেখে দিগে যা, ওরা তোকে কিছু দেবে না। এটা দিয়ে কিছু মিষ্টিটিষ্টি কিনে খাস, তুই ভালবাসিস পক্কান্ন মেঠাই, তাই খাস। কাউকে দেখাস নি।

এই সেই আংটি আমার হাতে এখনও রয়েছে।

আমার বন্ধু চুপ করল। আমার চোখে জল এল। বহুকাল

আগেকার এক রোগজীর্ণ তরুণী মায়ের ছবি মনে এল—অসহায় বন্ধুহীন সংসারে যার একমাত্র অবলম্বন ছিল ছ বছরের ছেলেটি আর এক দুর্ভাগ্য স্বামী।

আমার বন্ধু এখন খুব বড়লোক, অনেকগুলো কয়লার খনির মালিক। তাঁর সার্কুলার রোডের বাড়িতে ব'সে চা-পানের পরে সন্ধ্যাবেলা আমরা কথা বলছিলুম।

তারপরে তিনি ওপরের গল্পটা বললেন।

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে আমি বললুম, তারপর কি হ'ল?

রাত্রে কি হয়েছিল আর জানি না! ওরা এসে পড়বার পরেই আমি ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছিলুম। তারপর ঘুমিয়ে পড়ি। ভোরে উঠে মাকে আর দেখি নি! আমার ছেলেবেলাকার মা রাত্রের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এই রকম সন্ধ্যায় আবার সেই কতকাল আগের কথা—সেই সন্ধ্যাটি আমার মনে আসে।

খোসগল্প

জীবনে এমন সব অদ্ভুত ঘটনা অনেক সময় ঘটে, যা লিখিতে বসিলে যেন গল্পের মত শোনায়।

আমার জীবনে এমনি ধরণের ঘটনা একটি ঘটিয়াছিল, ঘটিয়াছিলই বা কি করিয়া বলি—ঘটিয়াছে বলাই সঙ্গত, কারণ তাহার জের এখনও চলিতেছে। যদিও বাহিরের দিক হইতে তাহার জের কিছুই নাই, যা কিছু ঘটিতেছে সবই আমার ও আর একজনের মনে।

প্রেমের কাহিনী এ নয়, কিসের কাহিনী বলা শক্ত। এত সূক্ষ্ম ও বস্তুবিহীন তার ঘটনা, যেন মাকড়সার জালে বোনা কাপড়—জোর করা চলে না তার ওপর—একটু বেশী বা একটু কম কথা বলিলেই ঘটনার সূক্ষ্ম রহস্যটুকু একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তাই খুব সতর্কতার সহিত ব্যাপারটি বলিতে চেষ্টা করিতেছি।

আর ভূমিকা করিব না, এখন গল্পটা বলি।

প্রথমেই আমার একটু পরিচয় দিয়া লই। যাঁহারা এ গল্প পড়িবেন, তাঁহাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটা লাইনও যেন বাদ দিবেন না—মনে রাখিবেন এর প্রতি লাইনের প্রয়োজনীয়তা আছে, গল্পটিকে সম্যক্ বুঝিতে হইলে।

যে-সময়ের কথা বলিতেছি তখন আমি বিবাহ করি নাই, করিবার ইচ্ছাও ছিল না। কেন কি বৃত্তান্ত সে-সব গল্পের পক্ষে অবান্তর। সুতরাং সে-কথার দরকার নাই।

বিবাহ করি নাই বলিয়া ভবঘুরেও ছিলাম না।

ছোট একটি ব্যবসা ছিল। তাহা হইতে দু-পয়সা রোজগারও হইত। এখন সে-ব্যবসা আরও বাড়িয়াছে। কাজের খাতিরে মাঝে মাঝে দেশ-বিদেশে ঘুরিতে হইত, এখনও হয়। কলিকাতায় বাড়ী এখনও করি নাই, তবে হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবান্ধবগণ যেমন ধরিয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে বাড়ী না করিলে আর চলে না—চক্ষুলজ্জার খাতিরেও অন্ততঃ করিতে হইবে। বালিগঞ্জ অঞ্চলে সুবিধামত জমি দেখিতেছি। এই হইতেই আমার মোটামুটি পরিচয় আপনারা পাইলেন।

বর্দ্ধমান জেলায় বনপাশ ষ্টেশনে নামিয়া উত্তর দিকে বাঁধানো সড়ক ধরিয়া সাত আট মাইল গরুর গাড়ী করিয়া গেলে দিয়াখালি বলিয়া একটি গ্রাম পড়ে। এখানে আমার এক সহপাঠীর বাড়ী।

এই অঞ্চলে ব্যবসা উপলক্ষে মাঝে মাঝে যাইতাম। অর্থাৎ আখের গুড় কিনিতে বনপাশ হইতে ছ-মাইল দূরবর্ত্তী জগন্নাথপুরের হাটে আমাকে মাঘ ফাল্গুন মাসে প্রতিবৎসর যাইতে হইত।

যখনই গিয়াছি দিয়াখালি গ্রামে আমার সেই সহপাঠীর বাড়ীতে গিয়া একবার করিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিতাম। কলিকাতায় কলেজে একসঙ্গে বি-এ পড়িয়াছিলাম, আমার সে বন্ধুটি বি-এ পাস করিতে পারে নাই, গ্রামেরই মাইনর স্কুলে অনেকদিন হইতেই সে হেডমাষ্টারি করিতেছে।

আমার বন্ধুর স্ত্রী পল্লীগ্রামের বধূ যদিও, আমার সামনে বাহির হইয়া থাকেন তো বটেই, আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার করেন, তাঁহাদের পরিবারেরই একজনের মত।

মেয়েমানুষের যেমন স্বভাব, যখনই যাই, আমার বন্ধুপত্নী আমায় বাঁধা নিয়মে অনুযোগ করিতেন, আমি কেন বিবাহ করিতেছি না।

এ-নিয়মের ব্যতিক্রম যত বার সেখানে গিয়াছি কখনও ঘটিতে দেখি নাই।

—শুনুন, এবার একটি বড়সড় দেখে, এই ফাল্গুন মাসের মধ্যেই বিয়ে ক'রে ফেলুন। না—শুনুন আমার কথা—এর পরে কে দেখবে শুনবে, সেটাও তো ভাবতে হবে? বিয়ে ক'রে ফেলুন।

এ ধরণের কথা শুধু আমার বন্ধুপত্নীর মুখ হইতে যদি শুনিতাম, হয়তো আমার মনে একথা কিছু রেখাপাত করিলেও করিতে পারিত। কিন্তু আমি তো এক দিয়াখালি গ্রামেই ঘুরি না—সারা বাংলা দেশের কত জেলায়, কত গ্রামে, কত শহরে কার্য্যোপলক্ষে ঘুরিতে হয় এবং প্রায় অনেক স্থানেই হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবান্ধবের মুখ হইতে ঐ একই কথা শুনিয়া আসিতেছিলাম।

আমার মাসীমা, পিসিমা এবং অন্যান্য আত্মীয়া-কুটুম্বিনী সমস্ত এ-বিষয়ে যথেষ্ট অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়া আসিতেছিলেন—ঘরে বাহিরে এভাবে অনুরুদ্ধ হওয়ায় জিনিষটা আমার যথেষ্ট গা-সহা-গোছের হইয়া পড়ার দরুন কোনো প্রস্তাবই তেমন গায়েও মাখিতাম না বা নূতন কিছু বলিয়া ভাবিতাম না।

এক বার দিয়াখালি গিয়াছি মাঘ মাসে, আমার বন্ধুপত্নী সেবার যে-কথা বলিলেন, তাহা শুনিয়া রীতিমত কৌতুক অনুভব করিলাম।

বলিলেন—আমি কিন্তু এক জায়গায় আপনার বিয়ে ঠিক ক'রে রেখেছি।

একটু কৌতুক করিয়াই বলিলাম—কি রকম?

—আজ প্রায় ছ-সাত মাস আগে আমাদের এখানে শিবতলায় বারোয়ারি শুনতে গিয়ে একটা মেয়ের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়। মেয়েটি এ গাঁয়ের নয়—তার দিদিমার সঙ্গে গরুর গাড়ী ক'রে পাশের গাঁ বারোদীঘি থেকে যাত্রা শুনতে এসেছিল। বেশ মেয়েটি, চমৎকার

গড়নপিটন, লম্বা, একহারা চেহারা। কেবল রংটি ফর্সা নয়, কালো। খুব কালো না হলেও কালোই মোটের উপর। নামটা ভুলে গেচি—খুব সম্ভব মণিমালা।

উৎসাহ দিবার সুরে বলিলাম—বেশ, তারপর?

—আমি তাকে বললুম আপনার কথা। আপনি কি করেন, কোথায় বাড়ী সব বলবার পরে তাকে বললুম এঁর সঙ্গে কিন্তু তোমার ভাই বিয়ের ঠিক করছি।

এমন কথা কখনও শুনি নাই। অবাক হইয়া বলিলাম—কি ক'রে বললেন? জানা নেই, শোনা নেই, বললেন অমনি বিয়ের কথা?

বন্ধুপত্নী পাড়াগাঁয়ের সহজ সারল্যের মধ্যে মানুষ হওয়ার দরুণই বোধ হয় এই অদ্ভুত আচরণের অদ্ভুতত্ব একেবারেই ধরিতে পারিলেন না। বলিলেন—কেন বলব না? আমার চেয়ে বয়সে যদিও ছোট, তবুও তার সঙ্গে সমবয়সীর মত ভাব হয়ে গেছল। বললুম, ওঁর একজন বন্ধু আছেন, তিনি মাঝে মাঝে আমাদের এখানে আসেন—আমি তাঁর সঙ্গে তোমার বিয়ের চেষ্টা করছি। এখন তুমি যদি মত দাও ভাই, তবে আমি ওঁর কাছে কথা পাড়ি।

—মেয়েটি কি বললে? মত দিলে?

—বললে, তিনি এতদিন বিয়ে করেন নি কেন? আমি বললুম, খেয়ালী লোক তাই। এবার বিয়ে করবার ইচ্ছে হয়েছে, তা ছাড়া তোমার মত মেয়ে পেলে নিশ্চয়ই বিয়ে করবেন। তার পরে মেয়েটি আপনার সম্বন্ধে আরও দু-একটি কথা জিজ্ঞেস করলে। আপনার বয়েস কত, মুখুজ্যে না চাটুজ্যে—কি পাস। কি পাস, এই কথাটা দু-বার ক'রে জিজ্ঞেস করলে। যখন বললুম বি. এ পাস—সে তা তো আবার বোঝে না। বললুম তিনটে পাস। তখন তার মুখ দেখে মনে হ'ল বেশ খুশীই হয়েছে। সুতরাং ও-পক্ষের মত আছে বোঝা গিয়েছে!

এখন আপনি মত ক'রে ফেলুন তো ঠাকুরপো। আমি সব ঠিক করি। বাপের নাম-ঠিকানা আমি জেনে নিইছি। ওঁকে দিয়ে চিঠি লেখাই—কেমন তো?

কোনো মতে সেবারের মত কথাটা চাপা দিয়া তো কলিকাতা ফিরিলাম। তাহার পর বছর-খানেক আমার সেখানে আর যাইবার দরকার হয় নাই। পুনরায় সেখানে গেলাম পরের বৎসর মাঘ মাসে।

সন্ধ্যায় বসিয়া গল্প করিতেছি, বন্ধুপত্নী বলিলেন কথায় কথায়—ঠাকুরপো, মনে আছে সেই মণিমালার কথা? এবারও যে শিবতলার বারোয়ারির দিন তার সঙ্গে দেখা হ'ল।

বলিলাম—বেশ কথা।

তিনি বলিলেন—তার বিয়ে এখনও হয় নি। গরিব ঘরের মেয়ে, বাপ থেকেও নেই, কে বিয়ে দিচ্ছে? ঐ দিদিমা ভরসা। ক-জায়গায় সম্বন্ধ হয়েছিল, টাকার বহর শুনে এরা পিছিয়েছে। তার উপর মেয়েটি অন্য দিকে যদিও খুব সুশ্রী, কিন্তু রং তো তেমন ফর্সা নয়। আমি কিন্তু আবার তুলেছিলাম আপনার সঙ্গে বিয়ের কথা। আহা, করুন না ঠাকুরপো, গরিবের মেয়ের দায় উদ্ধার? এবার সে নিজেই আপনার কথা জিজ্ঞেস করলে।

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—কি রকম?

বন্ধুপত্নী বলিলেন—আমার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গিয়েছে কি না। আমরা যেখানে বসি সেখানটাতে ব'সে কথা বললে কারও কানে যাবার ভয় নেই।

পরে একটু থামিয়া হাসিমুখে একটু সুর নামাইয়া বলিলেন—এ-কথা সে-কথার পরে আপনার কথা তুললাম। তা বললে, বি-এ পাস তো চাকরী না ক'রে ব্যবসা করেন কেন? আমি বললাম—স্বাধীন ব্যবসা

ভালবাসেন, টাকাও বেশ রোজগার করেন। আর একটা কথা বলেছে, শুনলে আপনি হাসবেন।

—কি কথা?

—বললে, আপনি দেখতে কেমন; কালো না ফর্সা।

কৌতুকের সুরে বলিলাম—আপনি কি বললেন?

—বললাম, না কালো, না ফর্সা, মাঝামাঝি।

—এঃ, আপনি আমার বিয়ের চান্সটা এভাবে মাটি ক'রে দিলেন?

বন্ধুপত্নী কৃত্রিম ভৎর্সনার সুরে বলিলেন- এর মধ্যে ঠাট্টার কথা কি আছে? না, ও হবে না। এই ফাল্গুন মাসের মধ্যেই বিয়ে করুন—সব ঠিক ক'রে ফেলি।

এ-ধরণের কথা খোসগল্প হিসাবেই শুনিয়া থাকি, এতই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি এ ধরণের কথায়। কাজেই যখন কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম তখন বেমালুম সকল কথাই মনের মধ্যে কোথায় তলাইয়া গেল কাজের হুড়াহুড়িতে।

বছর পার হইতেই জীবন অন্য পথে চলিল।

পূর্ব্বের ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া অন্য ব্যবসা খুলিলাম কলিকাতায়। সুতরাং জগন্নাথপুরের হাটে গুড় কিনিতে আর যাই না। ইতিমধ্যে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের অনুরোধে বিবাহও করিলাম। মেয়েটি পাইয়াছি ভালই, ভবানীপুর অঞ্চলে বাপের বাড়ী লেখাপড়া জানে, সুন্দরীও বটে। কিন্তু সবচেয়ে বড় গুণ—চমৎকার গান গায়।

বিবাহের পরও দেড় বছর কাটিয়া গিয়াছে। গত মাঘ মাসের কথা, এক দিন ভবানীপুরে শ্বশুরবাড়ী হইতেই ফিরিতেছি। বৈকাল গড়াইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যা হয়-হয়। পশ্চিম আকাশ লাল হইয়া উঠিয়াছে, ফোর্টের বেতারের মাস্তুলে লাল আলো জ্বলিয়াছে। বৈদ্যুতিক সংবাদপত্রের উজ্জ্বল অক্ষরে জানাইয়া দিল যে আবিসিনিয়ার সম্রাট্

লীগ্ অব নেশন্সে পুনরায় দরখাস্ত পেশ করিয়াছেন এবং মোহনবাগান হকি না ক্রিকেট খেলিতে বোম্বে যাইতেছে।

চৌরঙ্গীর মোড়ে বাস্ হইতে নামিতেই নজর পড়িল আমার সেই দিয়াখালির বন্ধুটি সস্ত্রীক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, সম্ভবতঃ বাসের প্রত্যাশায়। খুশীর সহিত আগাইয়া গেলাম।

—আরে, তুমি কলকাতায় যে! কবে এলে? এই যে নমস্কার, ভাল আছেন? অনেক দিন দেখাসাক্ষাৎ হয় নি—চিনতে পারেন?

বন্ধুপত্নী বলিলেন—চিনতে কেন পারব না? আপনি ডুমুরের ফুল হয়ে গেলেন তার পর থেকে। আপনার সঙ্গে আর কথা বলব না।

বন্ধুপত্নীকে মিষ্ট কথায় ঠাণ্ডা করিলাম। বন্ধুটির মুখে শুনিলাম তাহার ছোট শালী চিত্তরঞ্জন-সেবাসদনে চিকিৎসার জন্য আসিয়াছে আজ দিন পনর হইল—মধ্যে অবস্থা খারাপ হওয়াতে পত্র পাইয়া বন্ধুটি সস্ত্রীক শালীকে দেখিতে আসিয়া শ্যামবাজারে এক আত্মীয়বাড়ী উঠিয়াছে। এখন চিত্তরঞ্জন-সেবাসদন হইতেই ফিরিতেছে। মেট্রো বায়োস্কোপ দেখিবে বলিয়া এখানে নামিয়া পড়িয়াছে।

বন্ধু বলিল—চল না হে তুমিও চল। এ তো কখনো ওসব দেখতে পায় না, তাই ভাবলাম ফিরবার পথে মেট্রোতে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে যাব। আর এদিকে শালীটি ত সেরে উঠেছে, কাজেই মনও ভাল। এস আমাদের সঙ্গে।

অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া গেলাম মেট্রোতে। কয় বছর যাই নাই, বন্ধু ও বন্ধুপত্নী সেজন্য যথেষ্ট অনুযোগ করিলেন। কথায় কথায় বন্ধুপত্নী বলিলেন—বিয়ে করেছেন আপনি?

কথার কি উত্তর দিব ভাবিতে না-ভাবিতেই তিনি বলিলেন—করেন নি তা বেশ বুঝতে পারছি। উনিও বলেন, সে বিয়ে করলে কি আর আমাদের একখানা নেমন্তন্ন-পত্রও দিত না?… করেন নি—না?

এ-কথার পরে বিবাহ করিয়াছি কথাটা হঠাৎ বলা চলে না। সুতরাং তখনকার মত অর্থবিহীন হাসি হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। তবে হাসিটি যত দূর সম্ভব ব্যর্থসূচক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম মনে আছে।

ইণ্টারভ্যাল হইল। বন্ধুটি পান কিনিবার জন্য বাহিরে গেল।

আমার বিবাহের কথা বলিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলাম, ভাবিলাম এইবার মোলায়েম করিয়া বলিয়া ফেলি বন্ধুপত্নীর নিকট।

কিন্তু বন্ধুপত্নীও যে আর একটি কথা বলিবার সুযোগ খুঁজিতে-ছিলেন, তাহা বুঝি নাই। বলিলেন—জানেন একটা কথা বলি। সেই যে আমাদের দেশের মেয়েটির কথা বলেছিলুম মনে আছে? সেই মণিমালা?

—হ্যাঁ, খুব আছে।

মনে মনে একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম।

—এই গত পৌষ মাসে শিবতলায় আবার তার সঙ্গে দেখা। দু-বছর দেখা হয় নি, কথা আর ফুরুতে চায় না। তার বিয়ে হয় নি এখনও। কেন হয় নি সে-কথা আমি জিজ্ঞেস করি নি, তবে ভাবে বোঝা তো যাচ্ছে ও-রকম গরিব-ঘরের মেয়ের কেন বিয়ে হ'তে দেরি হয়।

আমি কথা বলিবার জন্যই বলিলাম—হ্যাঁ, তা বইকি।

—তার পর শুনুন, কথায় কথায় কলকাতার কথা উঠল। সে কখনও কলকাতা দেখে নি। আমি হেসে বললুম—আচ্ছা, তোমায় শীগ্‌গির কলকাতা দেখাচ্ছি। এ-কথায় মেয়েটি হাসলে। ভারী বুদ্ধিমতী মেয়ে, ও বুঝতে পেরেছে আমি কি বলছি। একটু পরে নিজেই বললে—আপনাদের বাড়ীতে সেই যে ভদ্রলোক আসতেন, তিনি আর আসেন না? আমি বললাম—অনেক দিন আসেন নি,

তার পর হেসে বললাম—তবে একটা কথা জানি, তিনি এখনও বিয়ে করেন নি, তাহলে একখানা নেমন্তন্নের চিঠি অন্তত আমরা পেতাম নিশ্চয়ই। মেয়েটি হেসে চুপ করে রইল। আমার বেশ মনে হয় সে এখনও মনে মনে ভাবে আপনি তাকে বিয়ে করবেন। তার উপর আবার শুনুন, হয়তো আমার উচিত হয় নি এত কথা বলা—আসবার সময় আবার তাকে বললাম—তাহলে কিন্তু এবার কলকাতা দেখার ব্যবস্থা করছি। মেয়েটির লজ্জা হ'ল কিন্তু মুখ দেখে মনে হ'ল ভারি খুশী হয়ে উঠেছে মনে মনে। মুখে কেবল একটা কথা বলেছিল উঠে আসবার সময়। যেন তাচ্ছিল্যের সুরে হঠাৎ বললে—আমার আর অমত কি, তবে তুমি ভাই দিদিমাকে একবার ব'লো। সত্যিই সে আপনার আশায় আশায় রয়েছে, এ আমি জোর ক'রে বলতে পারি। যা বলেছে, মেয়েমানুষ তার চেয়ে আর কি বেশী বলবে? এ দোষ আমারই, সেজন্যে ওঁর সামনে বললাম না। উনি শুনলে রাগ করবেন। আমার অনুরোধ, ঠাকুরপো, দয়া করে গরিব-ঘরের মেয়েটাকে নিয়ে তাদের দায় উদ্ধার করুন। আপনি তাকে নিয়ে জীবনে সুখী হবেন, একথা বলতে পারি। অমন সুশ্রী, সরলা, শান্ত মেয়ে পাবেন না—হ'লই বা গরিব?

আমার বন্ধু পান কিনিয়া ফিরিয়া আসাতে কথাটা চাপা পড়িল।

অতঃপর আর আমার বিবাহের কথা ইহাদের নিকট বলিতে পারিলাম না। হয়তো একটু গর্ব্ব করিয়াই বলিতাম আমার স্ত্রী সত্যই সুন্দরী, এমন কি ইহাও ভাবিতেছিলাম এক দিন উভয়কে বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া স্ত্রীর গান শুনাইয়া দিব—কিন্তু বন্ধুপত্নীর সহিত কথাবার্ত্তার পরে আমার মুখ যেন কে চাপিয়া ধরিল।

কেন যে এমন সব ধরণের ব্যাপার ঘটে!

কোথায় কাহাকে কে খোসগল্পের ছলে কি বলিল, তাহাই শুনিয়া

একটি সরলা পল্লীবালিকা মনে কি জানি কি সব স্বপ্নজাল বুনিতেছে এখনও, অথচ যাহাকে ঘিরিয়া এ স্বপ্ন রচনা—এ বিষয়ে সে কিছুই জানে না, সে দিব্য আরামে চাল দিয়া কলিকাতায় বেড়াইতেছে, বিয়ে-থাওয়া করিয়া নববধূকে লইয়া মশগুল হইয়া মহাসুখে দিন কাটাইতেছে!

সেই হইতে এই কয়মাস সুদূর রাঢ় অঞ্চলের একটি অদেখা পাড়াগাঁয়ের মেয়ের কথা আমি ক্রমাগত ভুলিবার চেষ্টা করিতেছি।

একটী দিনের কথা

একটীমাত্র দিনের কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার বটে, কিন্তু তার পেছনে সামান্য একটু ইতিহাস আছে। সেটা না বল্লে ব্যাপারটা তার সমস্ত নিষ্ঠুরতা ও নীচতা নিয়ে প্রকাশ হবে না। তাই একটু আগে থেকেই বলি।

একবার কলকাতা থেকে অনেকদূর একটা পাড়াগাঁয়ে আমার এক বন্ধুর ভ্রাতার জন্যে মেয়ে দেখতে যাই। যাঁদের জন্যে মেয়ে দেখতে যাওয়া, তাঁরা এসে আমায় বড় ধরাধরি করলেন যে, আমায় তাঁদের সঙ্গে যেতে হবে, কারণ ঐ গ্রামে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ী থাকায় সেখানকার অনেকেই আমার পরিচিত এবং আমি নিজে বার-কতক সে গাঁয়ে গিয়েছি, এ খবর তাঁরা জানতেন।

অগত্যা তাঁদের সঙ্গে যেতে হোল। জায়গাটা নিতান্তই পাড়াগাঁ। আমি সেখানে এর আগে দু একবার গেলেও আমার সেই আত্মীয়ের পাড়াটী ছাড়া অন্য অন্য পাড়ার লোকদের ভাল চিনিনে, বিশেষ কারো নামও জানিনে। যাঁদের বাড়ীতে মেয়ে দেখার কথা, তাঁরা এই অপরিচিত দলের লোক। প্রকৃতপক্ষে এই উপলক্ষেই তাঁদের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হোল এবং তাঁদের বাড়ীতে এই আমি প্রথম গেলুম। মেয়ের বাপের নাম গোপাল চক্রবর্ত্তী, বয়স ষাটের কাছাকাছি, আগে কি একটা ভাল চাকুরী করতেন, এখন চোখের

অসুখ হওয়াতে বাড়ী ছেড়ে কোথাও নড়তে পারেন না। ছেলেরা সব বড় বড়, মেয়েটীই ছোট। ভদ্রলোকের অবস্থা সচরাচর পাড়াগাঁয়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহস্থের যেমনি হয়ে থাকে তেমনি। বাইরে একখানা খড়ের চণ্ডীমণ্ডপ, একটা পুরানো কোঠাবাড়ী, উঠানের একধারে বাঁশের বেড়ার মধ্যে গোটাকতক জবাফুলের গাছ, নারিকেলের চারা, কুমড়োর মাচা ইত্যাদি। এক পাশে গোয়াল ও কাঠ-কুটো রাখবার আর একখানা ছোট চালা।

গোপাল চক্রবর্ত্তী আমাদের যত্ন আদর করলেন খুব। চা খাওয়ালেন, জলযোগ করালেন। মেয়ে দেখানও হোল—মামুলি প্রশ্নাদি জিগ্যেস করা ও মেয়ের তৈরী মামুলি পশমের আসন, হাঁস, তুলোর বেড়াল ও মাছের আঁশের কাজ ইত্যাদি দেখা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা উঠবার উদ্যোগ করলাম।

কথায় কথায় আমাদের মধ্যে একজন জিগ্যেস করলেন—এই কি আপনার বড় মেয়ে ?

গোপাল চক্রবর্ত্তী বল্লেন—না, এটী আমার দ্বিতীয় কন্যা। (বিবাহের ব্যাপারে পাড়াগাঁয়ে কথাবার্ত্তার সময় সাধুভাষা ব্যবহার করার পদ্ধতি প্রচলিত আছে)।

আমি বল্লুম—বড় মেয়েটীর কোথায় বিয়ে দিয়েছেন, চক্কত্তি মশায় ?—

না, তার এখনও বিবাহ হয়নি।

মনে একটা খটকাও লাগলো। এই মেয়েটীর বয়েস পনেরোর কম নয়। বড় মেয়েটীর বয়েস সুতরাং কম হোলেও সতেরো! অত-বড় আইবুড়ো দিদি ঘরে থাকতে তার ছোট বোনের বিয়ের আয়োজন উদ্যোগ—তবে কি বড় মেয়েটি কাণা খোঁড়া বা ঐ রকম কিছু ?

গোপাল চক্কত্তি তখনই আমাদের সন্দেহ দূর করলেন। তাঁর

বড় মেয়েটির এক জায়গায় সম্বন্ধ হয়েচে, পাত্রের বাড়ী আছে কলকাতায় হাতীবাগানে, পাত্র মার্চেন্ট আপিসে চাকুরী করে। চক্কত্তি মশায়ের ইচ্ছে, শ্রাবণ মাসের মধ্যে দুই মেয়েরই বিয়ে দিয়ে তিনি আপাততঃ নিশ্চিন্ত হন।

আমরা বিদায় নিলাম।

ওদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে কিছুদূর এসে বাঁ ধারে একটা পুকুর।

গ্রামের একটী ভদ্রলোক আমাদের এগিয়ে দিতে আসছিলেন, তিনি হঠাৎ পুকুরের বাঁধা ঘাটের দিকে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে বল্লেন—ঐ যে মেয়েটী দাঁড়িয়ে আছে, ঐ হোল গোপাল কাকার বড় মেয়ে রাণী—যার কথা হচ্ছিল—

কি ক্ষণে না জানি মেয়েটীকে যে দেখলুম! কত ছবি তো চোখের সামনে দিন রাত আসে যায়, ঢেউয়ের মাথায় ফেনার ফুলের মত তখন বেশ দেখায়, তারপর কোথায় যায় মিলিয়ে তলিয়ে, কোনো চিহ্নও রেখে যায় না। লক্ষ অখ্যাত ছবির মধ্যে একটী কি করে যে মনের মধ্যে সেদিন স্থায়ী দাগ রেখে গেল! চেয়ে দেখি একটী ষোল সতেরো বছরের মেয়ে পুকুরঘাটে জলের ধারে দাঁড়িয়ে আছে, বোধ হয় নাইতে এসে তখনও জলে নামেনি, মোটামুটী সুশ্রী মন্দ নয়, গায়ের রংটীও ফর্সা, স্বাস্থ্যবতী বটে। বাঁ হাতে একটা সাবানের পাত্র, একখানা রাঙা গামছা দুটি আঙ্গুল দিয়ে ধরে খেলার ছলে জলে ফেলে দিচ্ছে—কিছু না, অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার—অথচ আজও যখন ছবিটা কাজের ফাঁকে হঠাৎ মনে এসে পড়ে—

যাক্, ওসব কথা পরে বলবো—

আমাদের মধ্যে একজন বল্লেন—মেয়েটী তো বেশ দেখতে, এই মেয়েটীর সঙ্গে সম্বন্ধ হোলে খুব ভাল হোত। যে মেয়েটি দেখা গেল, তার চেয়ে এটী সত্যিই অনেক ভালো।

তারপর আমরা গ্রামের বাইরে মাঠে এসে পড়লুম—আমাদের সঙ্গের লোকটীও ফিরে গেলেন।

ওদের ব্যাপার আমি এই পর্য্যন্ত জানি। আমার বন্ধুর ভাইয়ের সেখানে বিয়ে হয় নি একথা আমি পরে অবিশ্যি শুনেছিলুম, কেন হয়নি সে খবর রাখবার আবশ্যক বিবেচনা করি নি। তবে শুনেছিলুম নাকি দেনা পাওনা নিয়ে কি একটা গোলযোগই সম্বন্ধ ভেঙে যাওয়ার কারণ।

এর পরে বছরখানেক কেটে গিয়েচে।

একদিন সকালে আমার বাসায় জন কয়েক ছোকরা এসে হাজির হোল। তাদের সকলের বাড়ী ঐ গ্রামে—তাদের মধ্যে আমার আত্মীয়টীর এক ভাইও আছে। সকলেই খুব ব্যস্ত সমস্ত।

আমায় বল্লে—শীগ্‌গির নিন্ তৈরী হয়ে—চলুন আমাদের সঙ্গে যেতে হবে—

—কি ব্যাপার? হয়েচে কি?

সকলেই সমস্বরে বল্লে—পথে বেরিয়ে শুনবেন, এখন বেরিয়ে পড়ুন চট্ করে—শ্মশানে যেতে হবে—কাশীমিত্তিরের ঘাটে—

খুব বিস্মিত হোলাম।

—কে মারা গিয়েচে? ব্যাপার কি?

আমার আত্মীয়ের ছেলেটি বল্লে—গোপাল কাকার মেয়ে রাণীর স্বামী আজ মারা গিয়েচে। এখানে বিয়ে হয়েছিল হাতীবাগানে—বিয়ের পর তিনমাস এখনও পোরেনি। আর একটি ছেলে বল্লে—তার চেয়েও বিপদ, রাণীর দেওর আর শাশুড়ীর ব্যবহার ভয়ানক খারাপ—তারা কেউ শ্মশানে যাবে না—মুখাগ্নি করতে হবে রাণীকেই—দেওর এখন চেষ্টায় আছে, নগদ টাকা গহনা সরাবে, দাদার বৌকে ফাঁকি দেবে। সে ভয়ানক ব্যাপার, চলুন না, গিয়ে শুনবেন সব।

আমরা কি জানতাম কিছু, আজ সকালে রাণীর সেজদা ললিত আমাদের মেসে এসে খবর দিলে যে, একা সে কিছু করতে পারচে না—আমরা তো গাঁয়ের একদল ছেলে মেসে আছি—বল্লুম—আমরা থাকতে ভয় কি? চলো যাই। ললিতকে তো ওরা বাড়ী ঢুকতেই দেয় না—দেওরটা এমনি করেছিল।

কাশীমিত্রের ঘাটে পৌঁছে দেখি রাস্তার দিকের পাঁচীলের এক কোণে একটা খাট নাবানো—তাতে চাদর-ঢাকা একটি মৃতদেহ। খাটের পাশে সেই মেয়েটি বসে আছে, যাকে সেবার ওদের গাঁয়ের পথের ধারে পুকুর ঘাটে নাইতে নামতে দেখেছিলুম সাবানের বাক্স হাতে। ওর পরণে রাঙাপাড় শাড়ী, মাথার চুলগুলো রুক্ষ ও অগোছালো, চোখে-মুখে একটা দিশাহারার ভাব—যেন সে বুঝতে পারচে না যে, কি হচ্ছে বা কেন সে এখানে এসেচে। কিন্তু তার চোখে জল দেখলাম না। সেও যেন একজন এই ব্যাপারের নিস্পৃহ উদাসীন দর্শক আরও পাঁচজন বাইরের লোকের মত, এই রকম ভাবটা তার মুখে। খাটখানা এবং মেয়েটির চারিধারে ঘিরে কতকগুলি ছোকরা।

আমায় দেখে ওদের মধ্যে একজন বলে উঠলো—এই যে এসেচেন? আপনাকে আনতেই বলে দিলুম আমরা। আমরা তো সব ছেলে-ছোকরা, একজন আপনাদের মত লোক উপস্থিত না থাকলে আমরা ভরসা পাইনে।

আর একটি ছোকরা বল্লে—দেখুন, এমন চামার রাণীর দেওরটা—ভাই মরে পড়ে আছে, সে সিন্দুক বাক্স সামলাতে ব্যস্ত। রাণীর তো দুর্দ্দশা যে কি করেচে এই ক'দিন, এর দাদা না থাকলে বোধ হয় ওকেও ওই সঙ্গে মেরে ফেলতো। টাকার ভাগ, বাড়ীর ভাগ ওকে দিতে হবে, এই আপশোষে মা আর ছেলে মরে যাচ্ছে। সে যদি

দেখতেন কাণ্ডটা! আপনি যদি বলেন, আমরা চিতায় চড়িয়ে দিই মড়া। দেখুন, মুখাগ্নি করতে পর্য্যন্ত এল না ভাই—এই ছোট মেয়েটাকে দিয়ে সব কাজ করাতে হবে—সঙ্গে অন্য একটী মেয়েমানুষ পর্য্যন্ত নেই—ওর শাশুড়ীকে কত করে বল্লাম—এলো না।

মৃতদেহ চিতায় তুলে দিতে পরামর্শ দিলাম।

রাণীর দাদা তার হাত ধরে তাকে দিয়ে মুখাগ্নি করালে।

মুখাগ্নি নিষ্পন্ন হয়ে গেলে তার দাদা তাকে একপাশে বসালে। দু'একটী কথায় নীচু স্বরে বোনকে কি বলছিল, বোধ হয় সান্ত্বনা-সূচক কথা।

এমন সময়ে একটি কাণ্ড ঘটলো।

কোথা থেকে তিন জন লোক এসে উপস্থিত হোল। একজনের বয়েস তেইশ চব্বিশ, বৃষকাষ্ঠের মত শুক্‌নো চেহারা, মাথায় লম্বা লম্বা চুল, সামনে পেছনে ঘাড়ের দিক চাঁচা। সখের থিয়েটার দলে ফুলুট বাজায়—চেহারাখানা এমনি ধরণের! বাকী দু'জন বেশী বয়সের লোক—কিন্তু তাদের মুখ দেখলে মনে হয়, ওদের বংশে তিন পুরুষের মধ্যে কারো অক্ষর পরিচয় ঘটেনি, এমনি চাষাড়ে-চোয়াড়ে মুখ।

ছোকরাটী আসতেই মেয়ের দাদা বল্লে—এই যে আসুন ধীরেন বাবু—মাকে আনলেন না? ছোকরা সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে চোয়াড়ে ধরণের একজন লোককে দেখিয়ে বল্লে—ইনি আমার মামা। এঁকে নিয়ে এলাম, নইলে আপনারা ত আমার কথা শুনবেন না!

—কি কথা?

এইবার সেই মামা নিজে এগিয়ে এসে মেয়ের ভাইকে বল্লে—আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে, একটু এদিকে আসুন; মেয়ের ভাই তার সঙ্গে এক পাশে গেল। দুজনে কি কথা হোল জানিনে, ভাই

ফিরে এসে আমার দিকে চেয়ে বল্লে—ইনি রাণীর মামাশ্বশুর। ইনি বলচেন রাণীর গায়ের গহনাগুলো দিতে ওঁর হাতে। আপনি কি বলেন? এই কথাতে মামাশ্বশুরের সঙ্গী সেই আর একজন চোয়াড়মত লোক চটে গেল। বল্লে—উনি কি বলবেন? মেয়ের মামাশ্বশুর আর দেওর নিজে এসে গহনা চাইচেন, উনি এর মধ্যে কি বলবেন?

কতকগুলো ছেলেছোকরা সমস্বরে কি একটা কথা বলতে গেল—আমি ওদের থামিয়ে দিয়ে মামাশ্বশুরকে বল্লুম—আপনি গহনা এখন চান কেন?

মামাশ্বশুর বল্লে—গহনা বৌমার গা থেকে হারিয়ে যেতে পারে, এমন গোলমাল আর ভিড়ের মধ্যে। আমাদের কাছে এখন রেখে দিই, এর পরে আবার দেবো—

বল্লুম—না, গহনা আমরা দিতে পারি নে।

মামাশ্বশুর মহা রুখে উঠলো।

—দিতে পারেন না? আপনি কে মশাই? আপনার কি অধিকার আছে দেবার না-দেবার? আমার বৌমার গহনা আমি নিতে এসেচি, আপনি যে বড়—

পেছন থেকে একজন ছোক্‌রা বল্লে—ওঃ ভারী বৌমা বৌমা এখন—বড় দরদ দেখাতে এসেচেন বৌমার ওপর—এতদিন কোথায় ছিলেন মশাই? কেশবের অসুখের সময় কোনদিন তো চুলের টিকিও দেখিনি—

মামাশ্বশুর বল্লে—মুখ সামলে কথা কও বলচি—

পেছনের সেই চোয়াড় লোকটা আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে এসে বল্লে—আলবৎ আমরা গহনা নিয়ে যাবো—আমাদের বৌয়ের গহনা আমরা নিয়ে যাবো তাতে কে কি করবে?

একটা হৈ হৈ বাধবার উপক্রম হয়ে উঠলো, মামাশ্বশুরের ও

তার সঙ্গীর এই কথায় আমি আমাদের দলের ছোক্‌রাদের থামিয়ে দিয়ে বল্লুম—আপনাদের গহনা আপনারা নিয়ে যাবেন কি না সে তর্ক আমরা করতে আসিনি, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস্ করি, আপনাদের ঘরেরই তো বৌ, ছেলেমানুষ, কাঁদ্‌চে, এই কি সময় ওর গা থেকে গহনা খুলে নেবার? এখন আমরা তা হতে দিতে পারি নে।

মামাশ্বশুর বল্লে—হতে দিতে পারেন না কি মশাই? আপনি যে বড্ড লম্বা লম্বা কথা বলচেন দেখতে পাই। হতে দিতে হবে—আমরা গহনা নিয়ে যাবোই, আপনি কি করবেন?

আমার ভয়ানক রাগ হয়ে গেল লোকটার ইতরামি দেখে। বল্লুম—আপনারা বলচেন আপনাদের বৌমা, এই বুঝি তার ওপর আপনাদের দরদের পরিচয়? গহনা নিতে এসেচেন এ সময় গা থেকে খুলে? গহনা যদি আমরা না দিই, কি করবেন আপনারা?

ওরা তিনজনেই আস্ফালন করে বলে উঠলো—গহনা জোর করে নিয়ে যাবো, আপনাদের কি অধিকার আছে গহনা আটকাবার? কে আপনারা? আলবৎ গহনা আমরা নিয়ে যাবো—

এইবার আমাদের ছেলের দল খেপে উঠলো—তারা সবাই রাণীকে ঘিরে দাঁড়িয়েচে ততক্ষণ। তারা বল্লে—কারো সাধ্যি নেই, আমরা এখানে থাকতে আমাদের গাঁয়ের মেয়ের গা থেকে কেউ গহনা ছিনিয়ে খুলে নিয়ে যায়—আসুক কে এগিয়ে আসবে দেখি—

একটা তুমুল হৈ চৈ ও বিশ্রী কোলাহলের সৃষ্টি হোল তারপরে। সকলেই একসঙ্গে কথা বলতে লাগলো—লোক জমে গেল চারিধারে—সকলেই জিজ্ঞেস্ করে, ব্যাপারটা কি? ওরাও চীৎকার করে—

—দেখে নেবো, কার সাধ্যি—

—কি হয়েচে মশাই? ব্যাপারটা কি মশাই?

—আলবোৎ নিয়ে যাবো,—কত জোর গায়ে আছে দেখবে?

—হাঁ হাঁ মশাই, থামুন,—থামুন—

—ভদ্রলোক না ছোটলোক—চামার একেবারে—

—মুখ সাম্‌লে—খবরদার—

—আমাদের বোনের মত—আমাদের গাঁয়ের মেয়ে—

—পুলিশ পুলিশ—

সবাই মিলে যখন একটা দক্ষযজ্ঞের সূত্রপাত করে তুলেচে, তখন হঠাৎ আমার চোখ পড়লো রাণীর দিকে! সদ্যোবিধবা হতভাগিনী বালিকা ভয়ে, বিস্ময়ে, লজ্জায় কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে উঠে বড় বড় ভীতিপূর্ণ চোখে যুধ্যমান দলদুটীর দিকে চেয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েচে—একে তো সে অজ্ঞ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, কলকাতাতেই বিয়ের আগে কখনো আসেনি, তার উপর আজই সে বিধবা হয়েচে। এত বেলা হয়েচে এক বিন্দু জল নিশ্চয়ই ওর মুখে যায়নি, এদিকে দেওর আর মামাশ্বশুরের এই কাণ্ডকারখানা···একপাল পুরুষ মানুষের মধ্যে আজকার দিনে ওই বালিকা একা, এমন আর একজন মেয়েমানুষ নেই যে চোখের জল মুছিয়ে দেয়, একটা সহানুভূতির কথা বলে। ওর সেই ছবিটা আমার মনে এল, ওদের গাঁয়ের পুকুরঘাটে সেই যে ওকে দেখেছিলুম—সহজ, সরল, নিশ্চিন্ত জীবনের আনন্দে ভরপুর, লীলাময়ী, সুন্দরী কিশোরী। একটা সুকুমার সন্ধ্যামালতী ফুলের লতাকে ছায়া বৃক্ষের শীতল আশ্রয় থেকে জোর করে ছিঁড়ে এনে কাশীমিত্রের ঘাটের চিতার আগুনের আঁচে বসানো হয়েচে···ওর চোখের জল পর্য্যন্ত শুকিয়ে গিয়েচে সেই আঁচে···

পুলিশের কথা শুনে ভাইবোন দুজনেই ভয় পেয়ে গেল।

পাড়াগাঁয়ের লোক, পুলিশ সম্বন্ধে ওদের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়।

বোন ভয়ে ভয়ে বল্লে—দাদা, তুমি ঝগড়া কোরো না ওদের সঙ্গে,

গহনা আমি খুলে দিচ্চি, তুমি ওদের ছাও—এই ধরো—পুলিশ আসবার আগেই দিয়ে ছাও দাদা—

দাদা আমায় বল্লে—দেখুন, আমি বলছি কুটুম্বের সঙ্গে একটা মনান্তর করে কি হবে, রাণীও বলচে গহনাগুলো না হয় দিয়েই—

বল্লুম—কক্ষনো না। তা হতে পারে না। পুলিশ আনবে আমুক না? ওদের সে সাহস হোলে তো? তুমি ভয় খেও না।

ছেলেরাও বল্লে—রাণী, তুই কিছু ভয় খাসনে। আমরা আছি এখানে কারো সাধ্য নেই কিছু করে। ওরা তিনজন আর আমরা এই এগারজন—

আমাদের দলের প্রতুল বলে যে ছোকরা আমার বাসায় আমাকে ডাকতে গিয়েছিল, সে বল্লে, আচ্ছা দাঁড়ান আপনারা সবাই একটু—আমি রজনী ডাক্তারকে ডেকে আনি. তিনি নিকটেই থাকেন, প্রবীণ মানুষ, তিনি রাণীর বরের চিকিৎসা করেছিলেন এই অসুখে। তিনি যে রকম পরামর্শ দেন, তাই করা যাবে- কি বলেন?

মামাশ্বশুর আর তার সঙ্গী কি একটা পরামর্শ করলে নিজেদের মধ্যে। তারপর ওদের সঙ্গী সেই চোয়াড় লোকটা কোথায় চলে গেল।

আমাদের দলের একটা ছোকরা বল্লে—গেল কোথায়?

বল্লুম—যেখানে যাক গে। চিতার দিকে লক্ষ্য রেখো—রাণীকে বসতে বলো ওর দাদার কাছে গিয়ে। রোদে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

দেওর আর মামাশ্বশুর আমাদের থেকে একটু দূরে বসেছে। কি একটা পরামর্শ আঁটছে দুজনে, বেশ বুঝতে পারা গেল। রাণীর ভাই একবার ভয়ে ভয়ে বল্লে—থানায় যায়নি তো?

আমাদের দলের কেউ কেউ বল্লে—ওরা নইলে আরও লোক আনতে গিয়েচে। একটা মারামারি না করে দেখছি ছাড়বে না।

রাণীর দাদা বল্লে—সেটা কি ভাল হবে? তার চেয়ে দিই না

গহনা ওদের হাতে? আমি বুঝিয়ে বল্লুম—কেন তুমি গহনা দিতে যাবে? এ গহনা ওরা দেয় নি, দিয়েছেন তোমার বাবা। ওদের কোন অধিকার নেই এতে। রাণীর শ্বশুরবাড়ীর যেমন গতিক দেখচি, তাতে মনে হয়, সেখানে ওর স্থান হবে না। ওই গহনাগুলোই ওর সম্বল। গহনার মধ্যে তো দেখছি একছড়া হার, আর হাতের চুড়ি কগাছা, আর তো কিছু নেই। তাই বা কেন হাতছাড়া করবে? গুণ্ডা আনে, আমরাও পুলিশে খবর দিতে পারি।

ওদের ফিরতে দেরী দেখে ভেবেছিলুম ব্যাপারটা আর বোধ হয় গড়ালো না; কিন্তু রাণীর অদৃষ্টে সেদিন আরও দুঃখ ছিল। একটু পরে সত্যিই ওরা একদল লোক নিয়ে ফিরে এল। আমাদের দেখিয়ে বল্লে—এরা কোথা থেকে এসেছে চিনি নে। উনি আমার বৌদিদি, মা আসতেন শ্মশানে, কিন্তু তিনি বাতের ব্যথায় নড়তে পারেন না। বৌদিদির ভাইয়ের মতলব গহনাগুলো হাতিয়ে নেওয়া, তাই বোধ হয় এই সব বন্ধুর দল এসেছে।

আবার একটা গোলমাল, তর্ক-বিতর্ক, চেঁচামেচি সুরু হোল। তখন গোলমাল শুনে পুলিশ এসে না পড়লে হাতাহাতি পর্য্যন্ত হতে বাকী থাকত না। আমাদের দুই দলকেই থানায় যেতে হবে বল্লে।

ইতিমধ্যে দাহকার্য্য শেষ হয়ে গিয়েছিল—আমরা রাণীকে স্নান করিয়ে নিলাম। থানায় গিয়ে ঘণ্টাখানেক আটকে থাকতে হোল। নানারকম জেরা জবানবন্দি চললো আমাদের উপর। রাণী তো ভয়েই সারা। সে ভাবলে গহনাগুলো খুলে না দেওয়ার অপরাধে পুলিশে এখুনি তাকে হাজতে আটকে রাখবে। অপর পক্ষের লোকেরা নিজেদের সাচ্চা প্রতিপন্ন করতে আমাদের ঘাড়ে নানারকম দোষ চাপালে এমন কি রাণীর সম্বন্ধেও দু'একটা এমন কথা বল্লে, যা থানার বাইরে বল্লে আমাদের দলের ছোকরারা ওদের হাড় গুঁড়িয়ে দিত।

বেলা তিনটার সময় থানা থেকে আমাদের ছুটি হোল।

রাণীকে এখন কোথায় পাঠান যায়?......

ওর শ্বশুরবাড়ীতে ওকে নিয়ে তোলা আমাদের কেউ সমীচীন মনে করলে না—বিশেষ করে এইমাত্র যখন তার দেওরের সঙ্গে এই কাণ্ডটা ঘটে গেল।

আমরা ওর ভাইকে পরামর্শ দিলাম, ওকে বাপের বাড়ী নিয়ে যেতে। নইলে একা শ্বশুরবাড়ীতে ওকে রেখে গেলে দেওর আর শাশুড়ীতে মিলে ওর যা দুর্দ্দশা করবে, সে কল্পনা না করাই ভালো। ভাইয়ের কাছে আবার দু'জনের যাওয়ার মত ভাড়া নেই। আমাদের যার কাছে যা ছিল দিয়ে দু'জনের দু'খানা টিকিট কিনে ওদের শেয়ালদা' ষ্টেশনে ট্রেণে উঠিয়ে দিতে এলাম।

শুনলুম ও বিয়ের পর জোড়ে একবার বাপের বাড়ী গিয়েছিল বরের সঙ্গে নববধূর সাজে, সেই যে এসেছিল, আর এই যাচ্ছে।

সেই কথা মনে হওয়ার দরুণ বা অন্য কিছু জানিনে, যাবার সময় রাণী খুব কাঁদতে লাগলো। এতক্ষণ ও তেমন কাঁদেনি। সারাদিনে যে ঝড় ওই মেয়েটার ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে, তারপরে ও যেন একেবারে কান্নায় ভেঙে পড়তে চাইচে।

ওর সে কান্না শুনলে বড় কষ্ট হয়। ছেলেমানুষের মত কান্না·· চীনে মাটীর সাধের পুতুলটা ভেঙে গেলে ছোট মেয়ে যেমন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে তেমনি···স্বামীহীনা সদ্য বিধবার কান্নার মত নয় কান্নাটা ···মনে হয় ছেলেমানুষই তো, খেলার ঘরের পুতুল-ভাঙার কান্নাটাই শিখে রেখেচে, বড় মেয়ের মত ট্র্যাজিক কান্না কাঁদতে শেখেনি এখনও।

এর পরে রাণীর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি বা তার খোঁজও রাখি নি। যদি বেঁচে থাকে, তার বয়স এখন ছাব্বিশ সাতাশ, বাপের বাড়ীতে ভাইয়ের স্ত্রীর দাসীবৃত্তি করে দুমুষ্টি অন্নসংস্থান করচে, অকালে

বুড়ী হয়ে গিয়েচে, হয়তো বা এতদিন শুচিবাই রোগেও ধরেচে। এ ছাড়া আর তার কি হবে?

কিন্তু ওর সেই ছেলেবেলাকার পুকুরঘাটের সেই কুমারী দিনের ছবিটি আমার চিরকাল মনে রয়ে গেল···পুকুরের বাঁধা ঘাটে নামচে··· দু'আঙুলে ধরে রাঙা গামছাখানা খেলার ছলে জলে ফেলে দিচ্চে লীলাময়ী বালিকা···সেই ছবিটা যেন কিছুতেই ভুলতে পারি নে।

বাটি চচ্চড়ি

সংসারটা এমন কিছু বড় নয়। মাত্র দুটো মেয়েমানুষ এবং একজন পুরুষের সমবায়ে গঠিত। ডাক্তার, ডাক্তারের বৌ এবং তাদের এক বিধবা পিসিমা, আবার এই পিসিমা ডাক্তারের চেয়ে বছর দশেকের ছোট। সরকারী হাসপাতালের পুরোণ ডাক্তার। চক্রধরপুরে বদলি হয়েছে সম্প্রতি। ছোট্ট সংসার—আরও ছোট্ট একখানা বাড়ীতে অবস্থিত—বেশ ভাল ভাবেই চল্‌ছিল সুখে শান্তিতে, হাসিতে ও আনন্দে। উদয়াস্ত সুমহান্ কাল কেটে যাচ্ছিল মোহন ছন্দে।

এ হেন সময়ে ডাক্তার একখানা চিঠি পেল এই মর্ম্মে, কলকাতা থেকে নাকি তার বাপের ছোট কাকার বড় ছেলের রুগ্ন বধূ আসছে তার শরীরের ক্ষতিপূরণ করতে এই পাহাড়ের দেশে। অলকার স্বামীই ডাক্তারের চেয়ে অনেক ছোট।

প্রস্তাবনাটা পিসিমার কাছে উত্থাপিত হলে তো সে প্রতিবাদ করলে, "বেশ, আসুক ছোট বৌদি। আমি কলকাতায় যাব—এখানে থাকতে পারবো না।"

ডাক্তার প্রতিবাদ করলে, "তা'হলে এখানে দিন চলবে কি করে?"

"সে আমি কি জানি ভাই পো।" পিসিমা ঐ বলেই ডাক্তারকে সম্বোধন করে।

"কিন্তু বৌমা আসছেন রোগা মানুষ। তাঁকে দিয়ে তো আর

সংসারের কাজ করানো যাবে না। আর তোমাদের বৌ তখন হয়ে পড়বে একা—ছেলে পিলে নিয়ে আর ক'দিক সামলাবে বল? তা ছাড়া কলকাতায় তো দেখছি মানুষের অভাব তেমন নেই।"

সুতরাং পিসিমাকে থেকে যেতে হ'ল। অলকার সঙ্গে তার আজ প্রায় পাঁচ বছরের বিবাদ। সেই বিবাদের ঝাঁঝেই সে প্রতিবাদ কোরেছিল। তবে সে প্রতিবাদ টিকলো না কিছুতেই ডাক্তারের প্রবল যুক্তির কাছে।

ওদিকে অলকা এল যথাসময়ে। দীর্ঘ দিন ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে তার দেহের সক্রিয় কলকব্জাগুলো অচলপ্রায় হয়ে গেছে। শরীরের সে কান্তি বা শোভা নেই। মুখশ্রী হয়েছে কালিমালিপ্ত। গায়ের হাড়গুলো এমনভাবে বার হয়ে পড়েছে যে, তাদের এক একখানা করে গোণা যায় অক্লেশে।

আসার পরের দিন তো ডাক্তার পরীক্ষা করলে। দেখলে জীবনের আশা বড় কম। নিজের মৃত্যুর জন্যে সে নিজে দায়ী। কারণ সে মৃত্যু ডেকে এনেছে অথবা নিজের নির্ব্বুদ্ধিতায় ফলে এবং চিকিৎসার অভাবে। এমন কি, এ কথা বললে হয় তো অত্যুক্তি হবে না যে, সে ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিঃশেষের পানে এগিয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ নিছক ভাইটামিনের অভাবে বা খাদ্যপ্রাণের অকিঞ্চিৎকরতায়। স্বামীর দীর্ঘ দিনের বেকার অবস্থা রোগের আর একটি কারণ বলা যেতে পারে।

যা হোক বৌমার চিকিৎসা এবার চলতে লাগ্‌লো যথাসাধ্য। কিন্তু সে চিকিৎসার কোন সুফল ফললো না মাসখানেকের মধ্যেও। ডাক্তার হতাশ হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বস্‌লো। তবু অলকার রোগ কমলো না; পরন্তু বৃদ্ধি পেতে লাগলো একটু একটু করে দিন দিন সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ প্রতিপন্ন করে।

অলকার নুন খাওয়া নিষেধ। কোন এক রাজার মেয়ে নাকি

তার বাপকে নুনের মত ভালবাসতো। সুতরাং নুণের প্রয়োজনীয়তা কিংবা গুণ সামান্য নয়। তাই অলকা সচরাচর নুনহীন তরকারী খেত না। ডাক্তারের বৌ আবার লোককে খাওয়াতে নাকি বড় ভালবাসতো। সুতরাং অলকার খাওয়ার কষ্ট দেখে তার করুণ মন ক্লিষ্ট হোত অত্যন্ত। অনেক ব'লে ক'য়ে সে স্বামীর কাছ থেকে বৌমার সামান্য একটু বাটি চচ্চড়ি খাবার অনুমতি পেয়েছিল এবং প্রতিদিন তার জন্যে একটা বাটি চচ্চড়ি করে দিত সযত্নে।

সেদিন অনেকগুলো বিছানা পরিষ্কার করে উঠ্‌তেই ডাক্তারের বৌয়ের বেশ বেলা হয়ে গেল। পিসিমা তাড়াতাড়ি স্নান করে এসে রান্না করতে বসলো। আর বৌমা?—বাতায়ন পাশে বসে দূর আকাশের পানে তাকিয়ে দেখ্‌তে লাগলো অপরূপ মেঘের খেলা। দূরে অতিকায় ধূমের মত দাঁড়িয়ে আছে আকাশচুম্বী পর্ব্বত। তার নীচে ইতস্ততঃ বৃক্ষলতাশোভিত কাল বর্ণের ছোট ছোট পাহাড়। তাদের গায়ে লাল কাঁকরের বঙ্কিম পথরেখা—মনে হয় যেন কোন অচিন দেশে চলে গেছে পাহাড়ের বুক ব'য়ে। বৌমা অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিল এমন সময় ডাক্তারের বৌ ভিজে চুল মুছতে মুছতে এসে বল্‌লে, "বৌমা, আজ কি দিয়ে দুধ সাবু খাবে?"

"যা হোক দিয়ে খাব অখন মা।"

"কেন বাটি করতে দিলে না?"

"থাক্‌গে, কুটনো তো সব কোটা হয়ে গেছে।"

"তা হোক, তুমি একটা বাটি করতে দাও মা।" কথা শেষ করে ডাক্তারের বৌ গৃহত্যাগ করে আর বৌমা উঠে যায় বাটি চচ্চড়ির কুটনো কুটতে। পিসিমা কড়ার ওপর মাছ দিয়ে একবার বাটির পানে তাকিয়ে নিল, তারপর বললে, "বলি হ্যাঁগা বৌমা, আমার গতরে কি-এমন পোকা পড়েছে?"

বৌমা সবিস্ময়ে কহে, "কেন পিসিমা ?"

মুখরা পিসিমা তখন ফেটে পড়লেন, "আমি কি বাটির কুটনো কুটতে পারি না, না কুটলে হাতে পক্ষাঘাত হোত। তেজ করে আমায় একবার বলা হোল না। রোগ তো বার মাস লেগেই আছে। তার আবার অত দেমাক্ কিসের ?"

রুগ্না বধূটির শুষ্ক নয়নদ্বয় বিদীর্ণ করে ঝরে পড়ে অঝোরে মুক্তার মত অশ্রুকণা নিদারুণ ঘৃণায় ও বেদনায় ননদের এই বাক্যবাণের সুতীব্র আঘাতে। স্বামীর অর্থহীনতা এবং নিজের রোগের চিন্তায় তার সারা কোমল অন্তরাত্মা সহসা রী রী করে ওঠে। আর পিসিমার মুখে তখন যেন তুবড়ীতে আগুন লেগেছে। সমস্ত বারুদ না নিঃশেষিত হলে সে নীরব হবে না। বৌমা আস্তে আস্তে বাটিটা নিয়ে আসে সকলের অজ্ঞাতসারে।

ঘণ্টা দুয়েক পর পিসিমার বারুদ ফুরিয়ে যেতে ডাক্তারের বৌ এসে বল্লে, "বৌমা, বাটি আমায় দাও মা, আমি করে দিচ্ছি। ছিঃ ছিঃ, মানুষকে মানুষ অমন করে বলে ?"

বিশ বছরের রোগশীর্ণ বধূটি আজ সারা হৃদয় মথিত করে কেঁদে ফেলল বিপুল বেদনায়। শ্বশুর শাশুড়ীকে অকালে হারিয়ে সে আর বিধবা ননদের গঞ্জনা সহ্য করতে পারচে না। ডাক্তারের বৌ আঁচল দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বল্লে, "কেঁদ না মা, বাটিটা আমায় দাও।"

"না, থাক্ মা। বাটি আমি আর জীবনে খাব না।"

"ছিঃ, সে কি হয় মা ?"

"খুব হয়।"

ডাক্তারের বৌয়ের বহু অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও বৌমা বাটি বার করে দিলে না। ডাক্তারের বৌ বেলা একটা পর্য্যন্ত বাটির খোঁজে সমস্ত

কিছু তন্ন তন্ন করে দেখলো, কিন্তু কোথাও সে বাটি পাওয়া গেল ন আর পাওয়া গেল না সে কোটা তরকারীগুলো।

সেদিন রাত্তে ডাক্তার গিয়েছে রিহার্সাল দিতে। এবার পূজা নাকি ভারী ধুম করে থিয়েটার হবে। ডাক্তারের বৌ মুখের মধ্যে অনেকগুলো এলাচ পুরে ছারপোকা মারতে বিছানা পাতিপাতি করে খোঁজে—এ তার নিত্যকার অভ্যাস। রাতে সে বড় একটা ঘুমোয় না। এমন সময়ে পাশের ঘরে বৌমা উত্যক্ত হয়ে বল্লে, "ভাল জ্বালা, দরজাটা যে কিছুতেই খুলছে না মা।"

ডাক্তারের বৌ আলো নিয়ে এগিয়ে এল, "কি হয়েছে বৌমা ?"

"দেখ না মা, দরজার খিল কিছুতেই পাচ্ছি না।"

"দরজা তো খোলা বৌমা ?"

"তবে খিল কোথায় গেল ?"

ডাক্তারের বৌ জানে যে, তার জ্যাঠাইমা মৃত্যুর পূর্ব্বে ঐ রকম দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে গেছিল। বৌমার এই রহস্যজনক আচরণে সে রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। আস্তে আস্তে নিজে এসে দরজাটা খুলে দিলে।

সামান্য পরে বৌমা বাইরে থেকে ফিরে এসে আবার নিজের বিছানায় শোয় এবং ডাক্তারের বৌ মশা তাড়িয়ে পুনরায় মশারিটা গদির তলায় গুঁজে দেয়। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়ে জানে না। ডাক্তারের ডাকে ধড়মড় কোরে দরজা খুলে দিল।

ডাক্তার বললে, "যেন মোষ একেবারে। ঘুমে অচেতন।"

"থাক, খুব হয়েছে !"

"আধঘণ্টা ধরে একজন ভদ্রলোক ডাকছে।"

"সকালে অতগুলো কাঁথা তোষক কাচলে ও ভদ্রলোকেরও এই দশা হোত নিশ্চয়।"

ডাক্তার শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কতক্ষণ যে ঘুমঘোরে কেটেছিল

দুজনের তা' হয় তো তারা জানে না। ডাক্তারের বৌ সহসা সচেতন হ'ল স্বামীর আহ্বানে, "ওগো, ওগো, দেখ তো ও ঘরে বৌমা কি যেন বলছেন।"

ডাক্তারের বৌ শুনলে বৌমা পাশের ঘরে বলছে, দূর ছাই! কিছুতেই তো আলো জ্বলছে না।"

রুগ্নকণ্ঠে ক্ষীণস্বরে নিশীথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে অট্টহাসি হেসে ওঠে যেন কিসের ব্যাকুল প্রচেষ্টায়। ডাক্তারের বৌ গৃহে প্রবেশ করে দেখে সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। বৌমা মশারির মধ্যে হ্যারিকেনের ল্যাম্প নিয়ে গিয়ে অনবরত ফস্ ফস্ করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে যাচ্ছে আর সেই প্রজ্জ্বলিত কাঠি চিমনিতে ঠুকে ঠুকে নিবিয়ে ফেলছে প্রতিবার। এমনি করে জ্বালাতন হচ্ছে ব্যর্থতার বেদনায়। ডাক্তারের বৌ স্তম্ভিত হয়ে স্থাণুর মত স্থির হয়ে থাক্‌লো মুহূর্ত্ত, তারপর বল্‌লে, "বৌমা, ওকি কর্‌ছো মা।"

বৌমা মৃদু ক্রন্দনের সুরে বল্‌লে, "দেখ দিকিন্ মা, আলোটা কিছুতেই জ্বলছে না।"

বৌমার জ্ঞান সহসা ফিরে আসে। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত তাকিয়ে থাকে ডাক্তারের বৌয়ের পানে। ডাক্তারও এগিয়ে আসে—তারপর ত্বরিতে বৌমাকে পরীক্ষা করে বলে, "শীগ্‌গীর আগুন করে ওঁর হাত-পা সেঁক কর।"

এতক্ষণে পিসিমার ঘুম ভাঙ্গে। সে আলস্য ত্যাগ করে পিট্ পিট্ করে তাকিয়ে থাকে। ডাক্তার এসে তাড়াতাড়ি বৌমাকে একটা ইন্‌জেকসন্ করে দিলে তারপর বাইরে গিয়ে বল্‌লে, "না, এত করেও বৌমাকে বাঁচাতে পারলুম না।"

নয়নকোণ থেকে ঝরে পড়ে বিন্দু বিন্দু অশ্রুকণা। ডাক্তারের বৌয়েরও চক্ষু হয় বাদল দিনের সজল আকাশের ন্যায়।

মুহূর্ত্তে সব কিছু এলোমেলো হয়ে যায়। কলকাতায় টেলিগ্রাম করা হয় বৌমার স্বামীর কাছে। তবুও যদি একবার শেষ দেখা করতে পারে পারের ঘাটে।

ডাক্তার যথাসাধ্য চেষ্টা করলে। স্বামী এল দূরান্তর থেকে আর এল তার মেজদি, গলার বোতাম বাঁধা দিয়ে একেবারে শেষক্ষণে। তবুও বৌমা বাঁচল না। ডাক্তার কাঁদলো আর কাঁদলো তার বৌ, মৃতার স্বামী ও মেজ ননদ. শুধু কাঁদেনি তার বিধবা ছোট ননদ; কারণ মৃতার সঙ্গে তার কথা বন্ধ প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর যাবৎ। আর সেই কারণেই সারারাত দিক্‌ভ্রান্ত একজনকে মশারির মধ্যে দেশলাই জ্বালাতে দেখেও নিবারণ করতে পারেনি কিছুতেই।

এই ঘটনার দিন সাতেক পর ডাক্তারের বৌ কোন এক মধ্যাহ্নে ভাঁড়ার ঘর গোছাতে গোছাতে একটা খালি হাঁড়ির মধ্যে পেল সেই বাটিটা আর তার মধ্যেকার কতকগুলো শুকনো তরকারী। পুরোণ ক্ষতে আবার যেন নতুন করে আঘাত লাগলো, একটা ব্যথিত দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বুকের মধ্যেই চেপে ধরলো। মর্ম্মন্তুদ বিচ্ছেদ-বেদনা লাঘব করলে না সশব্দ শোকার্ত্ত বাক্যবিন্যাসে, কেবল সজল নয়নে তাকিয়ে রইলো সেই বাটির পানে আর শুকনো তরকারীগুলোর পানে।

তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প

মধুসুন্দরী দেবীর আবির্ভাব।

তারানাথ তান্ত্রিকের প্রথম গল্প আপনারা শুনিয়াছেন কিছুদিন আগে, হয়তো অনেকেই বিশ্বাস করেন নাই। সুতরাং তাহার দ্বিতীয় গল্পটি যে বিশ্বাস করিবেন এমন আশা করিতে পারি না। কিন্তু এই দ্বিতীয় গল্পটি এমন অদ্ভুত যে সেটি আপনাদের শুনাইবার লোভ সম্বরণ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

জগতে কি ঘটে না-ঘটে তাহার কতটুকুই বা আমরা খবর রাখি? "There are more things in Heaven and Earth, Horatio" ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব এই গল্পটি শুনিয়া যান এবং সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া ডিস্‌মিস্ করিবার পূর্ব্বে মহাকবির ঐ বহুবার উদ্ধৃত, সর্ব্বজন পরিচিত, অথচ গভীর উক্তিটী স্মরণ করিবেন এই আমার অনুরোধ।

তবে যিনি প্রত্যক্ষদৃষ্ট, এই স্থূল জগতের বাহিরে অন্য কোন সূক্ষ্ম জগৎ, কিংবা ভূতপ্রেত কিংবা অন্য কোন অশরীরী জীব কিংবা অপদেবতা-উপদেবতার অস্তিত্বে আদৌ বিশ্বাসবান নহেন, তিনি এ গল্প না-হয় না-ই পড়িলেন?

ভূমিকা রাখিয়া এখন গল্পটা বলি।

সেদিন হাতে কোন কাজকর্ম্ম ছিল না, সন্ধ্যার পূর্ব্বে মাঠ হইতে

ফুটবল খেলা দেখিয়া ধর্ম্মতলা দিয়ে ফিরিতেছিলাম। মোহনবাগান হারিয়া যাওয়াতে মনও প্রফুল্ল ছিল না—কি আর করি, ধর্ম্মতলার মোড়ের কাছেই মট্‌স লেনে (নম্বরটা মনে নাই তবে বাড়ীটা চিনি) তারানাথ জ্যোতিষীর বাড়ী গেলাম।

তারানাথ একাই ছিল। আমায় বলিল—এস, এস হে, দেখা নেই বহুকাল, কি ব্যাপার?

কিছুক্ষণ গল্পগুজবের পরে উঠিতে যাইতেছি এমন সময়ে ঘোর বৃষ্টি নামিল। তারানাথ আমায় এ অবস্থায় উঠিতে দিল না। আমি দেখিলাম বৃষ্টি হঠাৎ থামিবে না, তারানাথের বৈঠকখানায় বসিয়া আমরা দু-জনে। বৃষ্টির সময় মনে কেমন এক ধরণের নির্জ্জনতার ভাব আসে—বৃষ্টি না থাকিলে মনে হয় শহরশুদ্ধ লোক বুঝি আমার ঘরে আসিয়া ভিড় করিবে, কেহ না আসিলেও মনের ভাব এইরূপ থাকে, কিন্তু বৃষ্টি নামিলে মনে হয় এ বৃষ্টি মাথায় কেহই আসিবে না। সুতরাং আমার ঘরে আমি একা। তারানাথের ঘরে বসিয়াও সেদিন মনে হইল আমরা দু-জনে ছাড়া সারা কলিকাতা শহরে যেন কোথাও কোন লোক নাই।

সুতরাং মনের ভাব বদলাইয়া গেল। এদিকে সন্ধ্যাও নামিল। জীবনের অদ্ভুত ধরণের অভিজ্ঞতার কাহিনী বলিবার ও শুনিবার প্রবৃত্তি উভয়েরই জাগিল। ঘোর বৃষ্টি-মুখর আষাঢ়-সন্ধ্যায় আমরা মোহনবাগানের শোচনীয় পরাজয়, ল্যাংড়া আম অতিরিক্ত সস্তা হওয়ার ব্যাপার, চৌরঙ্গীর মোড়ে ওবেলাকার বাস্‌-দুর্ঘটনা প্রভৃতি নানারূপ কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ কোন্‌ সময় নারীপ্রেমের প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িলাম।

তারানাথ বেশ বড় জ্যোতিষী ও তান্ত্রিক হইলেও শুকদেব যে নয় বা কোন কালে ছিল না, এ-কথা পূর্ব্বের গল্পটিতে বলিয়াছি।

আশা করি, তাহা আপনারা ভোলেন নাই। নারীর সঙ্গে সে যে বহু মেলামেশা করিয়াছে, এ-কথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং তাহার মুখ হইতেই এ বিষয়ে কিছু রসাল অভিজ্ঞতার কথা শুনিব, এরূপ আশা করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই ছিল, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে সে এ সম্বন্ধে যে অসাধারণ ধরণের অভিজ্ঞতার কাহিনীটি বর্ণনা করিল, তাহার জন্য, সত্যই বলিতেছি, আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না।

আর একটা কথা, তারানাথকে দেখিয়া বা তাহার মুখে কথা শুনিয়া আমার মনে হইয়াছিল একটা কি ঘোর দুঃখ মনে সে চাপিয়া রাখিয়াছে, অনেকবার তন্ত্রশাস্ত্রের কথাবার্ত্তা বলিতে গিয়া যেন কি একটা বলি বলি করিয়াও বলে নাই, আজ বুঝিলাম তারানাথের তান্ত্রিক জীবনের অনেক কাহিনীই সে আমার কাছে কেন, কাহারও কাছে বলে নাই, হয়তো সেগুলি ঠিক বলিবার কথাও নহে—কারণ সে-কথা বলা তাহার পক্ষে কষ্টকর স্মৃতির পুনরুদ্বোধন করা মাত্র। তা ছাড়া আমার মনে হয়, লোককে সে-সব গল্প বিশ্বাস করানোও শক্ত।

বলিলাম—জ্যোতিষী মহাশয়ের এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আছে অনেক—কি বলেন ?

তারানাথ বলিল—অভিজ্ঞতা একটাই আছে এবং সেটা বড় মারাত্মক রকমের অদ্ভুত। প্রেম কাকে বলে বুঝেছিলাম সেবার। এখন কিন্তু সেটা স্বপ্ন বলে মনে হয়—শোনো তবে—

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—কোন ট্র্যাজিক গল্প বলবেন না, প্রথম প্রেম হ'ল একটি মেয়ের সঙ্গে, সে মারা গেল—এই তো? ও ঢের শুনেছি। তারানাথ হাসিয়া বলিল—ঢের শোন নি! শোন—কিন্তু বিশ্বাস যদি না কর তাও আমায় বলবে! এরকম গল্প বানিয়ে বলতে পারলে একজন গল্পলেখক হয়ে যেতুম হে!······দু-একজন নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া একথা কারও কাছে বলিনি।

ঠিক এই সময় বাড়ীর ভিতর হইতে তারানাথের বড় মেয়ে চারু ওরফে চারি দু-পেয়ালা গরম চা ও দুখানি করিয়া পরোটা ও আলুভাজা আনিল। চারি দশ বছরের মেয়ে, তারানাথের মতই গায়ের রং বেশ উজ্জ্বল, মুখ-চোখ মন্দ নয়। আমায় বলিল—কাকাবাবু, লেসের কাপড়ের ছবিটা আনলেন না? চারির কাছে কথা দিয়া রাখিয়াছিলাম, ধর্ম্মতলার দোকান হইতে তাহার উল-বোনার জন্য একটা ছবির ও প্যাটার্নের নক্সা কিনিয়া দিব। বলিলাম—আজ ফুটবলের ভিড় ছিল, কাল এনে দেবো ঠিক।

চারি দাঁড়াইয়া ছিল, তারানাথ বলিল—যা তুই চলে যা, দুটো পান নিয়ে আয়—

মেয়ে চলিয়া গেলে আমার দিকে চাহিয়া বলিল—ছেলে-পিলের সামনে সে-সব গল্প—চা-টা খেয়ে নাও, পরোটাখানা—না না, ফেলতে পারবে না, ইয়ং ম্যান তোমরা এখন—খাওয়ার বেলা অমন—ওই বৃষ্টির জলেই হাত ধুয়ে ফেলো—

চা পানের পরে তারানাথ বলিতে আরম্ভ করিল।

তান্ত্রিক তারানাথের দ্বিতীয় গল্প।

মধুসুন্দরী দেবীর আবির্ভাব।

বীরভূমের শ্মশানের যে পাগলীর অদ্ভুত কাণ্ড সেবার গল্প করে-ছিলাম, তার ওখান থেকে তো চলে এলাম সেই কাণ্ডের পরেই।

কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি আমার একটা অত্যন্ত শ্রদ্ধা হয়ে গেল তার পর থেকে। নিজের চোখে যা দেখলুম, তা তো আর বিশ্বাস না ক'রে পারি না। এটা পাগলীর কথা থেকে বুঝেছিলুম, পাগলী আমায় ইন্দ্রজাল দেখিয়েছিল নিম্নতন্ত্রের সাহায্যে। কিন্তু সে তো ব্ল্যাক ম্যাজিক ছাড়া উচ্চতন্ত্রের কথাও বলেছিল। ভাবলাম দেখি না কি আছে এর মধ্যে। গুরু খুঁজতে লাগলুম।

খুঁজলে কি হবে, ও-পথের পথিকের দর্শন পাওয়া অত্যন্ত দুর্লভ।

এই সময়ে বহু স্থান ঘুরে বেড়িয়ে আমার দুটি মূল্যবান অভিজ্ঞতা হ'ল। প্রথম, ধুনি-জ্বালানো সাধুদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন ব্যবসাদার, ধর্ম্ম জিনিসটা এদের কাছে একটা বেচাকেনার বস্তু, ক্রেতাকে ঠকাবার বিপুল কৌশল ও আয়োজন এদের আয়ত্তাধীনে। দ্বিতীয়, সাধারণ মানুষ অত্যন্ত বোকা, এদের ঠকানো খুব সহজ, বিশেষতঃ ধর্ম্মের ব্যাপারে।

যাক ও-সব কথা। আমি ধুনি-জ্বালানো ব্যবসাদার সাধু অনেক দেখলুম, ইন্সিওরেন্সের দালাল দেখলুম, দৈবী ঔষধের মাদুলি বিক্রেতাকে দেখলুম, সাধুবেশী ভিক্ষুক দেখলুম—সত্যিকার সাধু একটাও দেখলুম না।

এ অবস্থায় বরাকর নদীর ধারে শালবনের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রামের সীমায় এক মন্দিরে একদিন আশ্রয় নিয়েছি, শীত কাল, আমি বনের ডালপালা কুড়িয়ে আগুন করবার যোগাড় করতে যাচ্ছি, এমন সময়ে একজন শ্যামবর্ণ, ঋজু ও দীর্ঘাকৃতি প্রৌঢ় সাধু দেখি একটা পুটুলি বগলে মন্দিরে ঢুকছেন। আমি গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলুম।

সাধুটি বেশ মিষ্টভাষী, বললেন—তুই যে দেখছি বড় ভক্ত। কি চাস্ এখানে? বাড়ী ছেড়ে দেখছি রাগ করে বেরিয়েছিস।

আমি বিনীত প্রতিবাদের সুরে বলতে গেলুম—রাগ নয় বাবাজী, বৈরাগ্য—

সাধুজী হেসে বললেন যে-কথাটি পাগলীও বলেছিল।

—ওহে ছোকরা, সাধু হব বললেই হওয়া যায় না। তোর মধ্যে ভোগের বাসনা এখনও পুরো মাত্রায় রয়েছে। সংসার ধর্ম্ম কর্ গে যা।

মন্দির থেকে কিছু দূরে ছাতিম-গাছের তলায় সাধুর পঞ্চমুণ্ডির আসন—পাঁচটি নরমুণ্ড পেতে তৈরী। সাধু রাত্রে সেখানে নির্জ্জনে

সাধনা করেন তাও দেখলুম। মনে ভারী শ্রদ্ধা হ'ল, সংকল্প করলুম এ মহাপুরুষকে ছেড়ে কোথাও যাচ্ছিনে এবার।

কিছুদিন লেগে রইলাম তাঁর পিছনে। তাঁর হোমের কাঠ ভেঙে এনে দিই, তিন মাইল দূরের কুসুমবনী ব'লে গ্রাম থেকে তাঁর চাল-ডাল কিনে আনি। গ্রামের সকল লোকের মুখে শুনলুম সাধুটি বড় একজন তান্ত্রিক। অনেক অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ তাঁর আছে। তবে পাগলীর কাছে যেতে লোকে যেমন আমায় ভয় দেখিয়েছিল—এখানেও তেমনি ভয় দেখালে। বললে--তান্ত্রিক সাধু-সন্নিসিদের বিশ্বাস করো না বেশী। ওরা সব পারে, একটু সাবধান হয়ে চ'লো। বিপদে পড়ে যাবে।

শীঘ্রই ওদের কথার সত্যতা একদিন বুঝলুম।

গভীর রাত্রেতে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছে সেদিন, শুক্লপক্ষের রাত্রি, বেশ ফুটফুটে জ্যোৎস্না। মন্দির থেকে ছাতিম গাছের দিকে চেয়ে দেখি সাধু বাবাজী কার সঙ্গে পঞ্চমুণ্ডির আসনে ব'সে কথা বলছেন। কৌতূহল হ'ল—এত রাত্রে কে এল এই নির্জ্জন নদীতীরের জঙ্গলের মধ্যে?

কৌতূহল সামলাতে না পেরে এগিয়ে গেলুম। অল্প দূর গিয়েই যা দেখলুম তাতে আর এগিয়ে যেতে সঙ্কোচ বোধ হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম।

সাধু বাবাজী এত রাত্রে একজন মেয়েমানুষের সঙ্গে কথা বলছেন—গাছের আড়াল থেকে মেয়েমানুষটিকে আমি খানিকটা স্পষ্ট খানিকটা অস্পষ্টভাবে দেখে আমার মনে হ'ল মেয়েটী যুবতী এবং পরমা সুন্দরী।

এত রাতে গুরুদেব কোন্ মেয়ের সঙ্গে কথা বলছেন, সে মেয়েটি এলই বা কেমন ক'রে একা এই নির্জ্জন জায়গায়?

যাই হোক, আর বেশীদূর অগ্রসর হ'লেই ওরা আমায় টের পাবে। মনে কেমন ভয়ও হ'ল, সে দিন চলে এলুম। তারপর দিন রাত্রে আমি

ঘুমুলাম না। গভীর রাত্রে উঠে পা টিপে টিপে বাইরে গিয়ে গাছের আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখি কাল রাতের সে-মানুষটি আজও এসেছে। ভোর হবার কিছু আগে পর্য্যন্ত আমি সেদিন গাছের আড়ালে রইলাম দাঁড়িয়ে। ফরসা হবার লক্ষণ হচ্ছে দেখে আর সাহস হ'ল না—মন্দিরে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন রাত্রেও আবার অবিকল তাই।

এদিন আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করলাম। যে-মেয়েমানুষটির সঙ্গে কথা হচ্ছে তার পরণের বস্ত্রাদি বড় অদ্ভুত ধরণের। সে যে কোন্ দেশের বস্ত্র পরেছে, সেটা না শাড়ী, না ঘাঘরা, না জাপানী কিমোনো, না মেমেদের গাউন!- অজানা যদিও, ভারী চমৎকার মানিয়েছেও বটে।

সেদিন আরও একটা কথা আমার মনে হ'ল।

মেয়েমানুষটী যেই হোক, সে জানে আমি রোজ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকি। কি ক'রে আমার একথা মনে হ'ল তা আমি বলতে পারব না, কিন্তু এই কথা আবছা ভাবে আমার মনের মধ্যে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে কেমন একটু ভয়ও হ'ল।

সরে পড়ি বাবা, দরকার কি আমার এ-সবের মধ্যে থেকে?

কিন্তু পরদিন রাত্রে ঠিক সময়ে আর শুয়ে থাকতে পারলাম না নিশ্চিন্ত মনে—উঠে যেতেই হ'ল। সেদিন আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করলাম—মেয়েমানুষটি যখন থাকে, তখন এক ধরণের খুব মৃদু সুগন্ধ যেন বাতাসে পাওয়া যায়—এ ক'দিনও এই গন্ধটা পেয়েছি, কিন্তু ভেবেছিলুম কোনও বন্য ফুলের গন্ধ হয়তো। আজ বেশ মনে হ'ল এ গন্ধের সঙ্গে ওই মেয়েটির উপস্থিতির একটা সম্বন্ধ বর্ত্তমান।

এই রকম চলল আরও দিন-দশ বারো। তার পরে সাধুর ডাক এল বরাকর না কোডার্ম্মার এক গাড়োয়ালী জমিদার-বাড়ীতে কি

শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করার জন্যে। সাধুজী প্রথমে যেতে রাজি হন নি, দু-দিন তাদের লোক ফিরে গিয়েছিল কিন্তু তৃতীয় বারে জমিদারের ছোট ভাই নিজে পাল্কী নিয়ে এসে সাধুকে অনেক খোসামোদ করে নিয়ে গেলেন।

মনে ভাবলুম, এ আর কিছু নয়, সাধুজী সেই মেয়েটিকে ছেড়ে একটি রাত্রিও বাইরে কাটাতে রাজি নন্।

কিন্তু নিকটে কোথাও বস্তি নেই, মেয়েটি আসেই বা কোথা থেকে? আর সাধারণ সাঁওতাল বা বিহারী মেয়ে নয়—আমি অনেকবার দেখেছি সেটিকে এবং প্রত্যেক বারই আমার দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছে এ কোন বড় ঘরের মেয়ে, যেমনি রূপসী, তেমনি তার অদ্ভুত ধরণের অতি চমৎকার এবং দামী পরণ-পরিচ্ছদ।

হঠাৎ আমার মনে একটা দুষ্টবুদ্ধি জাগল। আমার মনে হ'য়েছিল মেয়েটিকে সাধুজীর হয়তো খবর দেওয়ার সুযোগ হয় নি—দেখাই যাক না আজ রাত্রে সে আসে কি না? তখন ছিল অল্প বয়েস, তোমরা যাকে বল রোমান্স, তার ইয়ে তখন যে আমার যথেষ্টই ছিল, এতে তুমি আমাকে দোষ দিতে পার না।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু আগে রাত্রে সেদিন আমি নিজেই গিয়ে পঞ্চমুণ্ডির আসনে ব'সে রইলাম। মনে ভয়ানক কৌতূহল, দেখি আজ মেয়েটি আসে কি না! কেউ কোন দিকে নেই, নির্জ্জন রাত্রি, মনে একটু ভয়ও হ'ল—এ ধরণের কাজ কখনও করি নি কোন হাঙ্গামায় আবার না পড়ে যাই!

তখন আমি অপরিণতবুদ্ধি নির্ব্বোধ যুবক মাত্র, তখন ঘুণাক্ষরেও যদি জানতাম অজ্ঞাতসারে কি ব্যাপারের সম্মুখীন হতে চলেছি, তবে কি আর ছাতিমতলায় একা পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসতে যাই?

তাও নয়, ও আমার অদৃষ্টের লিপি। সে-রাত্রির জের আমার

জীবনে আজও মেটে নি। আমার মনের শান্তি চিরদিনের জন্তে হারানোর সূত্রপাতটি ঘটেছিল সেই কালরাত্রে—তা কি আর তখন বুঝেছিলাম!

যাক্ ও-কথা।

রাত ক্রমে গভীর হ'ল। পূব দিকের গাছপালার আড়াল থেকে চাঁদ উঠতে লাগল একটু একটু ক'রে। আমার ডাইনেই বরাকর নদী, দুই পাড়েই শিলাখণ্ড ছড়ানো, তার ওপর জ্যোৎস্না এসে পড়ল। সেই নদীর পাড়েই ছাতিমতলা ও পঞ্চমুণ্ডির আসন—আমি যেখানে ব'সে আছি। আমার বাঁ দিকে খানিকটা ফাঁকা ঘাসের মাঠ—তার পর শালবন সুরু হ'য়েছে।

হঠাৎ সামনের দিকে চেয়ে আমি চমকে উঠলুম। আমার সামনে সেই মেয়েটি কখন এসে দাঁড়িয়েছে এমন নিঃশব্দে, এমন অতর্কিত ভাবে যে আমি একেবারেই কিছু টের পাই নি! অথচ আগেই বলেছি আমার এক দিকে বরাকর নদীর জ্যোৎস্না-ওঠা শিলাস্তৃত পাড় আর এক দিকে ফাঁকা মাঠ। আসনে ব'সে পর্য্যন্ত আমি সতর্ক দৃষ্টিও রেখেছি—মাঠের দিকে। নদীর দিক থেকে আমার কাছে কারো আসা সম্ভব নয়—মাঠের দিক থেকে কেউ এলে আমার দৃষ্টি এড়ানোর কথা নয়। মেয়েটি যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখানে আধ সেকেণ্ড আগেও কেউ ছিল না আমি জানি, আধ সেকেণ্ড পরেই সেখানে জলজ্যান্ত একটি রূপসী মেয়ের আবির্ভাব আমার কাছে সম্পূর্ণ ইন্দ্রজালের মত ঠেকল ব'লেই আমি চমকে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই মৃদু মধুর সুগন্ধ! আমার সারা দেহ-মন অবশ আচ্ছন্ন হয়ে উঠল!···আমার জ্ঞানও বোধ হয় ছিল তার পর আর এক সেকেণ্ড। তার পরে কি ঘটল আমি আর কিছুই জানি না।

যখন আমার আবার জ্ঞান ফিরে এল তখন ভোর হয়েছে। উঠে

দেখি সারা-রাত সেই পঞ্চমুণ্ডির আসনেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলাম! নৈশ শীতল বায়ুতে বাইরে সারা-রাত পড়ে থাকার দরুণ গায়ে ব্যথা হয়েছে, গলা ভার হয়েছে। উঠে ধীরে ধীরে মন্দিরে চলে এলাম। এসে আবার শুয়ে পড়লাম। আমার মনে হ'ল আমার জ্বর হবে, শরীর এত খারাপ।

পরদিন সারাদিন কিছু না খেয়ে শুয়েই রইলাম আর কেবলই কাল রাত্রের কথাটা ভাবি।

মেয়েটি কে? কি ক'রে অমন নিঃশব্দে অতর্কিতে ওখানে এল? এ তো একেবারেই অসম্ভব। অসমান্য রূপসী যে মেয়েটি, অজ্ঞান হ'য়ে পড়বার পূর্ব্বে ওই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তা আমি দেখে নিয়েছিলুম। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লামই বা কেন, এরও ত কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পেলাম না! অথচ সেই কথা নিয়ে মনের মধ্যে তোলাপাড়া করাও সারাদিন আমার ঘুচল না। বিকেলের দিকে সাধুবাবাজী গাড়োয়ালী জমিদার-বাড়ী থেকে ফিরলেন। আমার জন্যে লাড্ডু, কচৌড়ি এবং একটা মোটা সুতি চাদর এনেছেন—তাঁর নিজের জন্যে জমিদার-বাড়ী থেকে ভাল একখানা পশমী আলোয়ান দিয়েছে।

আমায় বললেন—শুয়ে কেন? ওঠ—জিনিষগুলো রেখে দাও—

অতিকষ্টে উঠে সাধুর হাত থেকে পুঁটলিটা নিলাম। তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন—কি হয়েছে?·· অসুখ-বিসুখ নাকি?··

কিছু জবাব দিলাম না।

সাধু স্নান করতে গেলেন এবং এসে জমিদার-বাড়ীর কাণ্ড কি রকম তারই সবিস্তারে বর্ণনা করতে লাগলেন। আমায় বললেন—তোমার কি হয়েছে বল তো? অমন মন-মরা ভাব কেন? বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে বুঝি? বলেছি তো বাবা, তোমরা ছেলেছোকরা, এ-পথে কি নামলেই নামা যায় রে বাপু! বড় কঠিন পথ।

সেই রাত্রে আমার খুব জ্বর এল। কত দিন ঠিক জানি না—অজ্ঞান অচৈতন্য রইলাম। জ্ঞান হ'লেই দেখতাম সাধু শিয়রে বসে আছেন। বোধ হয় তাঁরই সেবাযত্নে এবং দয়ায় সেবার ক্রমে সেরে উঠলাম।

সেরে উঠে একদিন গাছতলায় বসেছি দুপুরের পরে, সাধু বললেন—ছেলেছোকরা কিনা, কি কাণ্ডটা বাধিয়ে বসেছিলে বাপু? এবার তো বাঁচতে না—অতিকষ্টে বাঁচাতে হয়েছে। আচ্ছা বাপু, পঞ্চমুণ্ডির আসনে কি জন্যে গিয়েছিলে সেদিন রাত্রে?

আমি তো অবাক। কি ক'রে জানলেন ইনি? আমি তো কোন কথাই বলি নি। হঠাৎ আমার সন্দেহ হ'ল, সেই অদ্ভুত মেয়েটির সঙ্গে নিশ্চয়ই সাধুর ফিরে এসে দেখা হ'য়েছে, সে-ই ব'লেছে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললেন—ভাবছ আমি কি ক'রে জানলাম, না?...আরে বাপু, কতটুকুই বা তোমরা বোঝ, আর কতটুকুই বা তোমরা জান! তোমাদের দেখে দয়া হয়।

ভয়ে ভয়ে বললাম—আপনি জানলেন কি ক'রে?

সাধু হেসে বললেন—আরে পাগল, তুমিই তো জ্বরের ঘোরে বলছিলে ঐ সব কথা—নইলে জানব কি ক'রে? যাক, প্রাণে বেঁচে গিয়েছ এই ঢের। আর কখনও অমন পাগলামি করতে যেও না।

আমি চুপ ক'রে রইলাম। তা হ'লে আমিই বিকারের ঘোরে সব ফাঁস ক'রে দিয়েছি!...সেইদিন মনে মনে সংকল্প করলাম দু-এক দিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাব—শরীরটা একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই।

কিন্তু আমার ভাগ্যলিপি অন্য রকম। সাধুবাবাজীকে তার পরদিন পাহাড়ী বিছুতে কামড়াল—তিনি তো যন্ত্রণায় অজ্ঞান হ'য়ে গেলেন। আমি পাঁচ মাইল দূরবর্তী মিহিজাম থেকে ডাক্তার ডেকে আনি তাঁর সেবা করি, দিনরাত জেগে তিন দিন পরে তাঁকে সারিয়ে তুলি।

দিন-দশেক পরে আমি এক দিন বললুম—সাধুজী আমি আজ চলে যেতে চাই।

সাধু বিস্মিত হয়ে বললেন—চলে যাবে? কোথায়?

—এখানে থেকেই বা কি হবে? আমার তো কিছু হচ্ছে না—মিছে ব'সে থাকা আর মন্দিরের প্রসাদে ভাগ বসানো। দুটি পেটের ভাতের লোভে আমি তো এখানে ব'সে নেই?

সাধুজী চুপ ক'রে গেলেন, তখন কোন কথা বললেন না।

সন্ধ্যার কিছু আগে আমায় ডেকে তিনি কাছে বসালেন। বললেন—ভেবেছিলাম এ-পথে নামাব না তোমায়। কিন্তু তুমি দুঃখিত হয়ে চলে যাচ্ছ, সেটা বড় কষ্টের বিষয় হবে আমার পক্ষে। তুমি আমার যথেষ্ট উপকার ক'রেছ, নিজের ছেলের মত সেবা করেছ। তোমাকে কিছু দিতে চাই। একটা কথা তার আগে বলি, তোমার সাহস বেশ আছে তো?

বললুম—আজ্ঞে হ্যাঁ। এর আগেও আমি বীরভূমের এক শ্মশানে তন্ত্র-সাধনা ক'রেছি!

তারপর আমি সেই শ্মশানের পাগলী ও তার অদ্ভুত ক্রিয়া-কলাপের কথা বললাম—এতদিন পরে আজ প্রথম সাধুকে পাগলীর কথা বললাম।

সাধু অবাক হয়ে বললেন—সে পাগলীকে তুমি চেন? আরে, সে যে অতি সাংঘাতিক মেয়েমানুষ! তুমি তার হাত থেকে যে অত সহজে উদ্ধার পেয়ে এসেছ সে কেবল তোমার পূর্ব্বজন্মের পুণ্য। ওর নাম মাতু পাগলী, মাতঙ্গিনী। ও নিম্নশ্রেণীর তন্ত্রে ভয়ানক ভাবে সিদ্ধ। ওর সংস্পর্শে গিয়ে পড়েছিলে, কি সর্ব্বনাশ! ওকে আমরা পর্য্যন্ত ভয় করে চলি—কি রকম জান? যেমন লোকে ক্যাপা শেয়াল-কুকুর কি গোখুরা সাপকে ভয় করে, তেমনি। ও সেই জাতীয়!

অসাধারণ ক্ষমতা ওর নিম্নতন্ত্রের। ওর ইতিহাস বড় অদ্ভুত, সে একদিন বলব। কত দিন ওর সঙ্গে ছিলে ?

—প্রায় দু-মাস।

সাধুজী ভেবে বললেন—যখন ওর সঙ্গে ছিলে, তখন কিছু কিছু অধিকার হ'য়েছে তোমার; তোমাকে আমি মন্ত্র দেব। কিন্তু তুমি যুবক, তোমার মনের ভাব আমি জানি। তুমি কি জন্যে রাত্রে পঞ্চমুণ্ডির আসনে গিয়েছিলে বল তো ?

আমি লজ্জায় মাথা নীচু করে রইলাম। মনের গোপন পাপ নেই, যদি পঞ্চমুণ্ডির আসনে ব'সে থাকি—তবে সেই অপরিচিতা নিশাবিহারিণী রূপসীর টানে যে, এ-কথা গুরুস্থানীয় ব্যক্তির কাছে স্বীকার করব কেমন করে।

সেই দিন সাধু অতি অদ্ভুত ও গোপনীয় কথা আমায় বললেন।

বললেন—কিন্তু একটা কথা তুমি জান না, সেটা আগে বলি। তুমি সেদিন যাঁকে রাত্রে ছাতিমতলায় ব'সে দেখেছিলে, তিনি তোমার আমার মত দেহধারী মানুষ নন্।

শুনে ত মশাই আমার গা শিউরে উঠল—দেহধারী জীব নয়, বলে কি রে বাবা! তবে কি ভূত-পেত্নী নাকি ?

সাধুজী বললেন—তোমায় একথা বলতাম না, যদি না শুনতাম যে তুমি মাতু পাগলীর সঙ্গে ছিলে। আচ্ছা শুনে যাও। আমার গুরুদেব ছিলেন ৺কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী, হুগলী জেলায় জেজুড় গ্রামে তাঁর মঠ ছিল। মস্ত বড় সাধক ছিলেন, কুলার্ণব আর মহাডামর এই দুই শ্রেষ্ঠ তন্ত্রে তাঁর সমান অধিকার ছিল। মহাডামর তন্ত্রের একটি নিম্ন শাখার নাম ভূতডামর। আমি তখন যুবক, তোমারই মত বয়েস স্বভাবতই আমার ঝোঁক গিয়ে পড়ল ভূতডামরের উপর। গুরুদেব আমার মনের গতি বুঝতে পেরে ও-পথ থেকে ফেরাবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু

তাই কি হয়? অদৃষ্টলিপি তবে আর বলেছে কাকে? এই তোমার যেমন—

আমি বললাম—ও-পথ থেকে ফেরাতে চেষ্টা করেছিলেন কেন?

—ও-পথ প্রলোভনের পথ, বিপদের পথ। ভূতডামর তন্ত্র নানা প্রকার অশরীরী উপদেবীদের নিয়ে কারবার করে—তন্ত্রের ভাষায় এদের সাধারণ নাম যোগিনী। জপে ও সাধনায় বশীভূত হয়ে এদের মধ্যে যে কেউ—যার সাধনা তুমি করবে—সে তোমার আপন হয়ে থাকতে পারে। নানা ভাবে এদের সাধনা করা যায়, কিঙ্কিণী দেবীকে মাতৃভাবে পেতে হয়, কনকবতী দেবীকে পাওয়া যায় কন্যাভাবে—কিন্তু বাকী সব যোগিনীদের যে-কোন ভাবে সাধনা করা যায় এবং যে কোন ভাবে পেতে পারা যায়। এই সব যোগিনীদের কেউ ভাল, কেউ মন্দ। এঁদের জাতি নেই, বিচার নেই, ধর্ম্ম নেই, অধর্ম্ম নেই, কোন গণ্ডি বা বাধ্যবাধকতার মধ্যে এঁরা আবদ্ধ নন। ভূতডামরে এই সাধনার ব্যাপার ব'লে দেওয়া আছে। ভূতডামরের প্রথম শ্লোকই হ'ল—

> অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি যোগিনী সাধনোত্তম্
> সর্ব্বার্থসাধনং নাম দেহিনাং সর্ব্বসিদ্ধিদম্।
> অতিগুহ্য মহাবিদ্যা দেবানামপি দুর্ল্লভা।

তুমি সেদিন যাঁকে দেখেছিলে, তিনি এই রকম একজন জীব। তোমার সাহস থাকে সে-মন্ত্র আমি তোমায় দেব। কিন্তু আমার যদি নিষেধ শোন, তবে এ-পথে নেমো না।

এতটা বলে সাধুজী ভাল করেন নি, আমায় কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়ে তিনি আমায় আর কি সামলে রাখতে পারেন? আমি নাছোড়বান্দা হয়ে পড়লাম, মন্ত্র নেবই।

সাধুজী বললেন—তবে কনকবতী দেবী-সাধনার মন্ত্র নাও—কন্যাভাবে পাবে দেবীকে—

আমি চুপ করে রইলুম।

তিনি আবার বললেন—তবে কিঙ্কিণী-সাধনার মন্ত্র?

আঃ, কি বিপদেই পড়েছি বুড়ো সাধুটাকে নিয়ে। অন্য যোগিনী-দের দেখতে দোষটা কি?

সাধু আমায় চুপ করে থাকতে দেখে বললেন—বেশ আমি তোমাকে মধুসুন্দরী দেবী-সাধনার মন্ত্র দিচ্ছি। এঁকে কন্যা ভাবে, ভগ্নী ভাবে বা ভার্য্যা ভাবে পেতে পার। তবে আমার যদি কথা শোন, কখনও ভার্য্যা ভাবে পেতে যেও না। এর বিপদের দিক বলি। ভার্য্যা ভাবে সাধন করলে তিনি তোমাকে প্রণয়ীর মত দেখবেন—কিন্তু এঁরা মহাশক্তিশালিনী যোগিনী, সাধারণ মানবী নয়, এদের আয়ত্তের মধ্যে রাখা বড় শক্ত। হয় তোমাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী মানুষ করে রাখবে, নয় তো একেবারে উন্মাদ করে ছেড়ে দেবে। সামলাতে পারা বড় কঠিন।

সাধুজী আমায় মন্ত্র দিলেন এবং বললেন—বাবা, এ জায়গা থেকে তোমায় চলে যেতে হবে। তোমায় এখানে আমি আর রাখতে পারি নে। এক জায়গায় দু-জন সাধকের সাধনা হয় না।

বেশ ভাল। আমিও তা চাইনে। আমার ভয় ছিল, হয় তো সাধুজীও মাতু পাগলীর মত হিপ্‌নটিজম্ জানে, এবং খানিকটা অভিভূত ক'রে যা তা দেখাবে আমায়। তারপর—

আমি তারানাথের কথায় বাধা দিয়া বলিলাম—কেন আপনি যে স্বচক্ষে পঞ্চমুণ্ডির আসনে কি মূর্ত্তি দেখেছিলেন তখন তো সাধু সেখানে ছিলেন না?

—তারপর আমার টাইফয়েড জ্বর হয় বলি নি? হয়তো পঞ্চমুণ্ডির আসনে যখন বসে, তখনই জ্বর আসছে, সে-সময় জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায়

অসুস্থ মস্তিষ্কে কি বিকার দেখে থাকব—হয়তো চোখের ধাঁধা। জ্বর ছেড়ে সেরে উঠে এ সন্দেহ আমার হয়েছিল, সত্যি বলছি।

যাক্ সে কথা। তারপরে ওখান থেকে চলে গেলাম বরাকর নদীর ধারে আর একটা নির্জ্জন জায়গায়। ওখান থেকে পাঁচ-ছয় মাইল দূরে। একটা গ্রাম ছিল কিছু দূরে, থাকতাম গ্রামের বারোয়ারী-ঘরে। গ্রামের লোকে যে যা দিত তাই খেতাম, আর সন্ধ্যার পরে নদীর ধারে নির্জ্জনে বসে মন্ত্রজপ করতাম।

এই রকমে একমাস কেটে গেল, দু-মাস গেল, তিন মাস গেল। কিছুই দেখিনে। মন্ত্রের উপর বিশ্বাস ক্রমেই যেন কমে যাচ্ছে। তবুও মনকে বোঝালুম - ছ-মাস পরে পূর্ণাহুতি ও হোম করার নিয়ম ব'লে দিয়েছিল সাধুজী। তার আগে কিছু হবে না। ছ'মাসও পূর্ণ হ'ল। সাধুজী যেমন ব'লে দিয়েছিল, ঠিক সেই সব নিয়ম পালন করলাম।

পদ্মাসনং সমাস্থায় মৎস্তেন্দ্রনাথ সম্মতম্
আমিষান্নৈঃ পুপধূপৈঃ সংপূজ্য মধুসুন্দরীম্

বরাকর নদীর তীরে বসে ভাত রাঁধলুম, কই মাছ পোড়ালুম, আঙট-কলার পাতায় ভাত ও পোড়ামাছের নৈবিদ্যি দিলাম। ডুমুরের সমিধ দিয়ে বালির উপর হোম করে ওঁ টং ঠং শ্লং ইঁং ক্ষং মধুসুন্দর্য্যৈ নমঃ এই মন্ত্রে আহুতি দিলাম। জাতিফুলের মালা নিতান্ত দরকার, কত দূর থেকে খুঁজে জাতিফুলের মালা এনেছিলাম—তার মালা ও চন্দন আলাদা কলার পাতায় রেখে দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে ধ্যানে বসলুম—সারারাত কেটে গেল।

বলিলাম—কিছু দেখলেন ?

—কা কস্য পরিবেদনা। ঘি, চন্দন, মিষ্টি কিনতে কেবল কতকগুলো পয়সার শ্রাদ্ধ হয়ে গেল। ধ্যান-জপ-হোমে কিছুই ফল ফলল না। রাগ করে টান মেরে সব নৈবিদ্যি ফেলে দিলাম নদীর জলে।

বেটা সাধু বিষম ঠকিয়েছে। কোনো ব্যাটার কোনো ক্ষমতা নেই—যেমন মাতু পাগলী, তেমনি এ সাধু। তন্ত্রটন্ত্র সব বাজে, খানিকটা হিপনটিজম্ জানে—তার বলে মূর্খ গ্রাম্য লোক ঠকিয়ে খায়।

এ-সব ভাবি বটে, জপটা কিন্তু ছাড়তে পারিনি, অভ্যেস মত ক'রেই যাই, ওটা যেন একটা বদ অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

এ-ভাবে আরও মাস চার-পাঁচ কেটে গেল।

একদিন সন্ধ্যার পরেই। রাত তখন হয়েছে সবে, আধ ঘণ্টাও হয় নি। আমি একটা গাছের তলায় বসে জপ করছি, অন্ধকার হ'লেও খুব ঘন হয় নি তখনও—হঠাৎ তীব্র কস্তুরীর গন্ধ অনুভব করলাম বাতাসে। বেশ মন দিয়ে শুনে যাও। এক বর্ণও মিথ্যে বলিনি। যা যা হ'ল একটার পর আর একটা বলছি, মন দিয়ে শোন। কস্তুরীর গন্ধটা যখন সেকেণ্ড চার-পাঁচ পেয়েছি, তখন আমার সেদিকে মন গেল। ভাবলুম এ দেখছি অবিকল কস্তুরীর গন্ধ! বাঃ, পাহাড়ে জঙ্গলে কত সুন্দর অজানা বনফুলই আছে!

তারপরেই আমার মনে হ'ল আমার পেছনে অর্থাৎ যে-গাছটার তলায় ব'সে ছিলাম, তার গুড়ির আড়ালে কে একজন এসে দাঁড়িয়েছে। আমি পেছন থেকে দেখতে পাচ্ছি নে বটে, কিন্তু অনেক সময় লোকের উপস্থিতি চোখে না-দেখেও এভাবে ধরা যায়। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় তখন যেন অতিমাত্রায় সজাগ ও সতর্ক হয়ে উঠেছে।

বাতাস যেন বন্ধ হয়ে গেল, সমস্ত শরীর দিয়ে যেন গরম আগুনের হল্‌কা বেরুচ্ছে মনে হ'ল। আবার অজ্ঞান হয়ে যাব নাকি? ভয় হ'ল মনে। ঠিক সেই সময় আমার সামনে দেখলাম একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। আধ সেকেণ্ড আগেও তিনি সেখানে ছিলেন না। ঠিক সেই পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসার রাত্রের সেই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি। কিন্তু এবার মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প করলাম জ্ঞান হারাব না কখনই।

মেয়েটি দেখি ঈষৎ ভ্রূকুটির সঙ্গে আমার দিকে চেয়ে র'য়েছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—নিজের চোখে এমনি এক মূর্ত্তি দেখলেন আপনি?

আমার কথার মধ্যে হয়তো একটু অবিশ্বাসের গন্ধ পাইয়া তারানাথ উগ্র প্রতিবাদের সুরে বলিল নিজের চোখে। সুস্থ শরীরে। বিশ্বাস কর না-কর সে আলাদা কথা—কিন্তু যা দেখেছি, তাকে মিথ্যে বলতে পারব্ না।

—কি রকম দেখলেন? কেমন চেহারা?

—ভারি রূপসী যদি বলি, কিছুই বলা হোল না। মধুসুন্দরী দেবীর ধ্যান আছে:

> উদ্যদ্ ভানু প্রতীকাশা বিদ্যুৎপুঞ্জনিভা সতী
> নীলাম্বর পরিধানা মদবিহ্বললোচনা
> নানালঙ্কার শোভাঢ্যা কস্তূরীগন্ধমোদিতা
> কোমলাঙ্গীং স্মেরমুখীং পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাম

অবিকল সেই মূর্ত্তি। তখন বুঝলাম দেবদেবীর ধ্যান মনগড়া কথা নয়, সাধকে প্রত্যক্ষ না করলে এমন বর্ণনা দেওয়া যায় না।

—আপনি কোন কথা বললেন?

—কথা! আমার চেতনা তখন লোপ পাবার মত হ'য়েছে—তো কথা বলছি! পাগল তুমি? সে-তেজ সহ্য করা আমার কর্ম্ম? সাধারণ মানবীর মত তার কোন জায়গাই নয়। ঐ যে বলেছে মদবিহ্বললোচনা—ওরে বাবা সে-চোখের কি ভাব! ত্রিভুবন জয় হয় সে-চোখের চাউনিতে।...

আমি অধীর হইয়া বলিলাম—বর্ণনা রাখুন। কি কথা হ'ল বলুন।

—কথাবার্ত্তা যা হ'য়েছিল, সব বলার দরকার নেই।

মোটের উপর সেই থেকে মধুসুন্দরী দেবী প্রতি রাত্রে আমায়

দেখা দিতেন নদীতীরের সেই নির্জ্জন জায়গায়। তাঁকে চেয়েছিলাম প্রিয়ারূপে—বলাই বাহুল্য, সাধুর কথা কে শোনে? তখন শীতকাল, বরাকর নদীর জল কম হয়েছে অনেক, জলের ধারে জলজ লিলিগাছ শুকিয়ে হলুদে হয়ে এসেছে, আগে যেখানে জল ছিল, সেখানে বালির উপর অভ্রকণা জ্যোৎস্নারাত্রে চক্‌চক্ করে, বরাকর নদীর দুপারের শালবন পাতা ঝরিয়ে দিচ্ছে। আকাশ রোজ নীল, রাত্রে শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নার বড় মনোরম শোভা—সেই সময় থেকে তিনটি মাস দেবী প্রতিরাত্রে দেখা দিতেন—সত্যিকার বাঁচা বেঁচেছিলাম ঐ তিন মাস। এসব কথাও বলা এখন আমার পক্ষে বেদনাদায়ক। কত বেদনাদায়ক তুমি জান না, আমার জীবনের যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ তো পেয়েছিলুম ঐ তিন মাসে। দেবীই বটে, মানুষের সাধ্য নেই অমন ভালবাসা, অমন নিবিড় বন্ধুত্ব দান করা—সে এক স্বর্গীয় দান··· সে তুমি বুঝবে না, তোমায় কি বোঝাব, তুমি আমায় অবিশ্বাস করবে, মিথ্যেবাদী না হয় পাগল ভাববে। হয়ত ভাবছ এতক্ষণ। তুমি কেন, আমার স্ত্রীই আমার কথা বিশ্বাস করে না, বলে, আমায় তান্ত্রিক সাধু পাগল করে দিয়েছিল গুণজ্ঞান করে।

কিন্তু সে সুখের প্রকৃতি ভীষণ তেজস্কর মদিরার মত। আমাকে তার নেশা দিনে দিনে কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ করে দিতে লাগলো। কিছু ভাল লাগে না। কেবল মনে হয় কখন সন্ধ্যা নামবে বরাকর নদীর শালবনে, কখন দেবী মধুসুন্দরী নায়িকার বেশে আসবেন। সারারাত্রি কোথা দিয়ে কেটে যাবে স্বপ্নের মত, নেশার ঘোরের মত, আকাশ, নক্ষত্র, দিক বিদিকের জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যাবে কয়েক প্রহরের জন্যে—কয়েক প্রহরের জন্যে সময় স্থির হয়ে নিশ্চুপ হয়ে স্থাণুর মত অচল হয়ে থেমে থাকবে বরাকর নদীতীরের বন প্রাঙ্গণে।

একদিন ঘটল বিপদ।

একটী সাঁওতালী মেয়ে রোজ নদীর ঘাটে জল নিতে আসে—সুঠাম তার দেহের গঠন, নিকটের বস্তীতে তার বাড়ী। অনেক দিন থেকে তাকে দেখছি, সেও আমায় দেখচে।

সেদিন সে জল নিয়ে ফিরে যাচ্চে। আমায় তাদের বাঁকা বাংলায় বল্লে—ছেলে হয়ে হয়ে মরে যায়, তার মাদুলি আছে তোমার কাছে সাধু বাবা ?

এমন ভাবে করুণ সুরে বল্লে—আমার মনে দয়া হোল। মাদুলি দিতে জানি একথা বলি নি, তবে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করেছিলাম। তারপর সে চলে গেল।

মধুসুন্দরী দেবীকে সেদিন দেখলুম অন্য মূর্ত্তিতে। কি ভ্রুকুটি কুটিল দৃষ্টি, কি ভীষণ মুখের ভাব! সে মুখের ভাব তুমি কল্পনা করতে পারবে না—চণ্ডিকা দেবীর রোষ কটাক্ষ যেমন লোল জিহ্ব, করালিনী প্রচণ্ডা কালভৈরবী মূর্ত্তির সৃষ্টি হয়েছিল—এও যেন ঠিক তাই।

সেদিন বুঝলুম আমি যার সঙ্গে মেলামেশা করি, সে মানুষ নয়—মানুষের পর্য্যায়ে সে পড়ে না। মানবী রাগ যতই করুক সে করালিনী হয় না, পিশাচী হয় না—মানবীই থেকে যায়।

ভীষণ পূতিগন্ধে সেদিন শালবন ভরে গেল—প্রতি দিনের মত কস্তুরীর সুবাস কোথায় গেল মিলিয়ে! তারপর এলেন মধুসুন্দরী দেবী—দেখেই মনে হোল এরা দেবীও বটে, বিদেহী পিশাচীও বটে। এদের ধর্ম্মাধর্ম্ম নেই, সব পারে এরা। যে হাতে নায়িকার মত ফুলের মালা গাঁথে, সেই হাতেই বিনা দ্বিধায়, বিনা অনুশোচনায়, নিমেষে ধ্বংস ক'রতে এরা অভ্যস্ত।

আমার ভীষণ ভয় হোল।

পিশাচী মধুসুন্দরী তা বুঝে বল্লে—ভয় কিসের ?

বল্লুম—ভয় কই ? তুমি রাগ করেছ কেন ?

খল খল অট্টহাস্যে নির্জ্জন অন্ধকার ভরে গেল। আমি শিউরে উঠলাম।

পিশাচী বল্লে—শব চিনতে পারবে? অন্ধকার রাত্রে সাঁওতালদের কোনো বৌয়ের শব তোমার সামনে যদি জলে ভেসে যায়—চিনতে পারবে? তুমি না যদি চিনতে পারো, দু'টি শবে জড়াজড়ি করে ভেসে থাকলে অন্য লোকে সকালে নিশ্চয়ই চিনবে।

হাত জোড় করে বল্লুম—দেবি, তোমায় ভালবাসি। ও মূর্ত্তি আমায় দেখিও না—আমায় মারো ক্ষতি নেই—কিন্তু অন্য কোন নিরপরাধিনী স্ত্রীলোকের প্রাণ কেন নেবে? দয়া করো।

বহু চেষ্টায় প্রসন্ন করলুম। তখন আবার যে দেবী, সে দেবী। বল্লেন—সেই সাঁওতালের মেয়ের মূর্ত্তিতে আমায় দেখতে চাও। সেই মূর্ত্তিতে এখনি দেখা দেবো।

বলতে বলতে সেই সাঁওতালদের মেয়েটা আমার সামনে দাঁড়িয়ে। বরং আরও নিটোল গড়ন শরীরের, মুখের ভাব আরও কমণীয়।

বল্লুম—ও চাই না—তোমার মূর্ত্তি দেখাও দেবী।

সেই রাত্রি থেকে বুঝলুম কালসাপ নিয়ে খেলা করচি আমি। গুরুদেব বারণ করেছিলেন এই জন্যেই। হয়তো একদিন মরবো এর হাতেই। সাপুড়ে সাপ খেলার মন্ত্রে—আবার বেকায়দায় পড়লে সাপের ছোবলেই মরে। এভাব বেশীদিন কিন্তু ছিল না। কিছুদিন পরে পিশাচী মূর্ত্তি ভুলে গেলুম দেবীর অনুপম প্রেমে ও মধুর ব্যবহারে। তাতেও বুঝলুম এ সাধারণ মানবী নয়—অমানুষিক ধরণের এদের মন। মানুষের বিবর্ত্তনের জীব এরা নয়। হয় তার ওপরে, নয় তার নীচে।

একদিন দেবী আমায় বল্লেন—আর কিছুদিন যাক্ তোমায় বহুদূরে নিয়ে যাবো—

—কোথায়?

—সে বলবো না এখন।

—কতদূরে? কোন্ দিকে?

—এতদূরে এমন দিকে যা তুমি ধারণা করতে পারবে না। তবে তোমার ভাগ্যে আছে কি তা?

সব ভুলে গেলাম আবার। পিশাচিনী মধুসুন্দরী তখন কোথায় মিলিয়ে গেছে—আমার সামনে হাস্যলাস্যময়ী, যৌবনচঞ্চলা, মুগ্ধস্বভাবা অপরূপ রূপসী, এক তরুণী নারী। দেবীই বটে।

আমি আবার কিসের নেশায় অভিভূত হয়ে পড়লুম, মাথার ঠিক রইল না।

একদিন বল্লেন—বিপদ আসচে তোমার তৈরী হও।

—কি বিপদ?

—তা বলবো না।

—প্রাণ সংশয়ের বিপদ?

—তা বলবো না।

—তুমি অভয় দিলে বিপদ কিসের?

—আমি ঠেকাতে পারবো না। কেউ ঠেকাতে পারবে না। যা আসচে, তা আসবেই।

কথা খেটে গেল শীগগির, খুব বেশী দেরী হয় নি।

তিন মাস পরে আমার বাড়ী থেকে লোকজন সন্ধানে সন্ধানে সেখানে গিয়ে হাজির। গ্রামের লোক তাদের বলেছে কে একজন পাগল, বোধ হয় বাঙালীই হবে, অল্প বয়েস, বরাকর নদীর ধারে শালবনে সন্ধ্যাবেলা ব'সে থাকে—আর আপন মনে বিড় বিড় ক'রে বকে। আমায় এ অবস্থায় গাঁয়ের অনেকেই নাকি দেখেছে।

তাই শুনে বাড়ীর লোক আমায় গিয়ে খুঁজে বার করলে। ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরনে, মাথায় জট, গায়ে খড়ি উড়ছে—এই অবস্থায় নাকি

আমায় ধরে। বাড়ী ধরে আনবার জন্যে টানাটানি, আমি কিছুতেই আসব না, ওরাও ছাড়বে না। আমার তখন সত্যিই জ্ঞান নেই, সত্যিই আমি ক্ষিপ্ত, উন্মাদ। ওরা হয়ত আমায় আনতে পারত না—কিন্তু যে দেবীকে পেয়েছিলাম প্রণয়িনী রূপে, তিনি নিরুৎসাহ করলেন।

—কি রকম ?

ওরা ধরে নিয়ে গিয়ে নিকটবর্ত্তী গ্রামের একটি গোয়ালঘরে আমায় বেঁধে রেখেছিল। গভীর রাত্রে বাঁধন ছিঁড়ে ওদের হাত থেকে লুকিয়ে পালিয়ে সেই একটি রাত মধুসুন্দরী দেবীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। দেবীকে বললাম—আমি এই নদীতীরের তীর্থস্থান ছেড়ে কোথাও যাব না। তিনি নিষ্ঠুর হাসি হেসে বললেন—যেতে হবেই, এই আমার অদৃষ্টলিপি। অদৃষ্টের বিরুদ্ধে তিনি অত বড় শক্তিশালিনী যোগিনী হয়েও যেতে পারেন না। তিনি জানেন, এই রাতের পরে জীবনে তাঁর সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে না। আগে থেকে বলে তৈরী করে রাখতে চেয়েছিলেন এই জন্যেই।

দেবী ত্রিকালজ্ঞা, তাঁকে জিজ্ঞেস করিনি কি ক'রে তিনি একথা জানলেন। হ'লও তাই, বাড়ী আসার পরে সবাই বললে কে কি খাইয়ে পাগল করে দিয়েছে। দিনকতক উন্মাদের চিকিৎসা চলল—বছর খানেক পরে আমার বিয়ে দেওয়া হ'ল। সেই থেকেই আমি সংসারী।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আর কখনো মন্ত্রজপ করে তাঁকে আহ্বান করেন নি কেন ?

বাপ রে। এ কি ছেলেখেলা ? মারা যাব শেষে ! অন্য নারী জীবনে এলে তিনি দেখা দেবেন ? সে-চেষ্টাও কখনো করি নি। সে কতকাল হ'য়ে গেল, সে কি আজকার কথা ?

—আচ্ছা, এখন আর তাঁকে দেখতে ইচ্ছে হয় না ?

বৃদ্ধ তারানাথ উৎসাহে, উত্তেজনায় বালিস বুকে দিয়া খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিল।

—ইচ্ছে হয় না কে বলেছে? বললুম তো ঐ তিনমাস বেঁচে ছিলাম। দেবী এসেছিলেন মানুষী হয়ে। এদিকে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী শক্তিরূপিণী যোগিনী, তেজে কাছে ঘেঁষা যায় না—অথচ কি মানবীই হয়ে যেতেন, যখন ধরা দিতেন আমায়! প্রিয়ার মত আসতেন কাছে, অমনই মিষ্টি, অমনই ঠোঁট ফুলিয়ে মাঝে মাঝে অভিমান, বরাকর নদীর ধারের শালবন রাত্রির পর রাত্রি তাঁর মধুর হাসিতে জ্যোৎস্নার মত উজ্জ্বল হয়ে উঠত—এমনি কত রাত ধরে! এক-এক সময় ভ্রম হ'ত তিনি সত্যিই মানুষীই হবেন।

বিদায় নিয়ে যাবার সেই রাতটিতে বললেন—নদীতীরের এই তিন মাসের জীবন আমিও কি ভুলব ভেবেছ? আমাদের পক্ষেও এ সুলভ নয়, ভেব না আমরা খুব সুখী। আমাদের মত সঙ্গীহারা, বন্ধুহারা জীব কোথায় আছে? প্রেমের কাঙাল আমরাও। কত দিন পরে এক জন মানুষে আমাদের সত্যিকার চাওয়া চায়, তার জন্যে আমাদের মন সর্বদা তৃষিত হয়ে থাকে। কিন্তু তাই ব'লে নিজেকে সহজলভ্য করতে পারিনে, আগ্রহ ক'রে যে না চায় তার কাছে যাই নে, সে আমার প্রেমের মূল্য দেবে না, নিজেও আনন্দ পাবে না, যা কিনা পাওয়া যায় বহু চেয়ে পাওয়ার পরে। কিন্তু আমাদের অদৃষ্টলিপি, কোথাও চিরদিন থাকতে পারিনে—কি না-কি ঘটে যায়, ছেড়ে চলে যেতে হয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও। ক'জন আমাদের ডাকে? ক'জন বিশ্বাস করে? সুখী ভেব না আমাকে।

বলিলাম—এত যদি সুখের ব্যাপার তবে আপনি ভয়ঙ্কর বলছিলেন কেন আগে?

—ব্যাপার ভয়ঙ্কর এই জন্যে যে আমার সারা জীবনটা মাটি হয়ে

গেল ঐ তিন মাসের সুখভোগে। কোন দিকে মনই দিতে পারিনে—মধ্যে তো দিন-কতক উন্মাদ হয়েই গিয়েছিলাম বিয়ের পরেও। তারপর সেরে সামলে উঠে এই জ্যোতিষের ব্যবসা আরম্ভ ক'রে যা হয় এক রকম—সেও দেবীরই দয়া। তিনি বলেছিলেন, জীবনে কখনও অন্নকষ্টে আমায় পড়তে হবে না। পড়তে কখনও হয়নি—কিন্তু ওতেই কি আর আনন্দ দেয় জীবনে?

তারানাথ গল্প শেষ করিয়া বাড়ীর ভিতরে যাইবার জন্য উঠিল। আমিও বাহির হইয়া ধর্ম্মতলার মোড়ে আসিলাম। এক অদ্ভুত, অবাস্তব জগৎ হইতে বিংশ শতাব্দীর বাস্তব সভ্যতার জগতে আসিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। যতক্ষণ তারানাথ গল্প বলিয়াছিল ততক্ষণ ওর চোখমুখের ভাবে ও গলার স্বরে গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস জাগে নাই—কিন্তু ট্রামে উঠিয়াই মনে হইল—

কি মনে হইল তাহা আর না-ই বা বলিলাম? *

* তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প, জন্ম ও মৃত্যু।

ডাইনী

অফিস থেকে ফিরে দেখলুম স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে বিছানায় শুয়ে
চম্‌কে গেলুম খুবই—ভয়ও পাই নি যে তা নয়। বিজুকে তো কখনও
ভর সন্ধ্যেবেলা এমন করে সংসারের কাজকর্ম্ম ফেলে শুতে দেখিনি
মেয়ের আবার কি বিপদ হোল? ভয়ে ভয়ে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস
কর্‌লুম, "ব্যাপার কি বিজু?"

বিজু কোন উত্তর দিলে না। তার কপালে হাত দিয়ে দেখলুম
জ্বর হয়েছে কি না। না, শরীরের উত্তাপ তো স্বাভাবিক। তবে!
স্ত্রীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ডাকলুম, "বিজু!"

এতক্ষণ পর বিজু কথা বল্লে, "কদ্দিন থেকে বল্‌ছি এ অলুক্ষণে
বাড়ীটা বদলে ফেল, বদলে ফেল। তা যদি কথা কানে কর্‌বে।
কলকাতায় কি আর বাড়ী আছে!"

সত্যি বটে বিজু ক'দিন থেকে বাড়ী বদল করবার জন্যে তাগাদা
কর্‌ছে; কিন্তু বাড়ী বদল করা তো আর সোজা কথা নয়। ভুক্তভোগী-
মাত্রেই জানে। সুতরাং কথাটা তেমন গ্রাহ্য করি নি। বল্‌লুম, "এ
বাড়ী কি দোষ করেছে?"

ব্যস্! বিজু যেন ফেটে প'ড়ল, "দোষ করেছে?—চারদিকে সব
ডাইনী। একটা মেয়ে নিয়ে যাও বা ঘর কচ্ছি, তা যদি ওদের
সহ্যি হয়!"

"ডাইনী!" আমি ওসব অন্ধবিশ্বাসকে প্রশ্রয় দিই না কানেও।

"তা বিশ্বাস হবে কেন? দেখ দিখি আজ দুপুর থেকে শানি কিচ্ছু মুখে করছে না। যা খাচ্ছে তাই তুলে ফেল্‌ছে।"

আমার মাথা ঘুরে গেল। শানি আমার আড়াই বছরের মেয়ে। তার ওপর ডাইনীবুড়ীর কোপ গিয়ে পড়লো কোন্ দুঃখে? বিজু তখনও বলে চলেছে, "আচ্ছা ওদের কি চক্ষুলজ্জাও নেই একটুও?"

আমি বল্লুম, "তা ডাইনীকে কোথায় দেখ্‌লে শুনি?"

"ঐ ওখানে।" অঙ্গুলি সঙ্কেতে বিজু পাশের বাড়ীর একটা ঘর দেখিয়ে দিলে। তার সন্দেহ দেখে আমার সর্ব্বাঙ্গ রী রী করতে লাগ্‌লো। আমি অস্ফুট স্বরে বল্লুম, "কমলা?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ! বিশ্বাস হয় না?"

"আশ্চর্য্য!"

"আশ্চর্য্য কিছুই নয়। কদিন থেকে দেখ্‌ছি ওর ঐ সোহাগ আদর—পোড়াকপালীর কপাল যখন পোড়া তখন অপরের কাচ্চাবাচ্ছার ওপর নজর দেওয়া কেন?"

আমি বিজুর প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারলুম না। মাসখানেকের কথা মনে পড়ল। একদিন ঐ পাশের বাড়ীর ঐ ঘরটায় কমলা চীৎকার করে উঠ্‌লো, "ওরে শোভা রে, তুই কোথায় গেলি রে? আমায় এমনি করে ফাঁকি দিলি কেন রে?"

রাত তখন প্রায় দশটা, আমি খেতে বসেছি। বিজু আমায় দুধের বাটিটা এগিয়ে দিতে দিতে বল্লে, "পাতের গোড়ায় একটু জল দাও।"

আমি বল্লুম, "কমলা কাঁদ্‌ছে না?"

"আগে পাতের গোড়ায় জল দাও দিকি।"

সত্যি কমলা কাঁদ্‌ছে সারা মাতৃ-হৃদয় মথিত করে কন্যার বিচ্ছেদ বেদনায়। দু'মাস আগে শোভা এসেছিল মর্ত্ত্যলোকে আর আজ চলে

গেল মায়ামমতার পাশ ছিন্ন করে। হয়ে পর্য্যন্ত মেয়েটা রোগে রোগে ভুগেছে। সর্ব্বাঙ্গে তার ঘা—বড় বড় দাগা দাগা। পুঁজের গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না। কিন্তু কমলা সমস্ত ঘৃণা তুচ্ছ করে শোভার সেবা করেছে দু'হাতে। তার ফলে নিজের গায়েও স্থানে স্থানে ঘা হয়েছে—সে সব গ্রাহ্য করেনি একটুও। সারা-হৃদয় নিয়োজিত ক'রেছে তার প্রাণসদৃশ শোভাকে আরোগ্য করবার প্রচেষ্টায়। বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ দেখান হোল—রোজা এসে কোড়া কাটলো—অসংখ্য দেবতার কাছে মানত করা হোল। চেষ্টার কোন ক্রটি রইলো না; কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ প্রতিপন্ন করে রাত দশটায় শোভা মহানিদ্রায় আক্রান্ত হোল। মা বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ে শতবার নাড়াচাড়া করে তাকে সজাগ করবার চেষ্টা করলে—বিনিয়ে বিনিয়ে তার প্রস্থানের জন্যে অনুশোচনা ক'রলে সারারাত্রি প্রায়।

সে ঘটনার মাসখানিক পর কমলা নাকি শানিকে দেখে একদিন কেঁদে ফেলে—বুকের একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস চাপতে পারেনি। তার নিঃশ্বাসের শব্দে আমার স্ত্রীর চিত্ত বিচলিত হয়। আস্তে আস্তে খুকিকে নিয়ে সরে আসে পাশের ঘরে। আমি তখন অফিসের হিসেবপত্র মিলাচ্ছি। বিজু আমার পাশে এসে বসলো। আমি চশমাটা আস্তে আস্তে চোখ থেকে খুলে বলি, ' কিছু বল্‌বে নাকি ?"

"না এমন কিছু নয়।"

আমি হাসি, বলি, "তা' ঐ এমন সামান্য কিছুই শুনি না কেন।"

"সত্যি, তোমার আবার এ সবে বিশ্বাস হয় না।"

"আঃ কৌতুহলই তো বাড়িয়ে দিচ্ছ কেবল।"

"তুমি এ বাড়ী বদলাও।"

"কারণ ?"

"কমলা রোজ রোজ শানির পানে তাকিয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ করে

নিঃশ্বাস ফেল্‌বে আর কাঁদ্‌বে। বাছার আমার অকল্যাণ হবে তাও বুড়ো মাগী ভুলে যায়।"

"পাগল!" আমি হাসতে লাগলুম।

"ঐ তো! তুমি সব কথা উড়িয়ে দাও কেবল। কপাল যখন পোড়া তখন অপরের ছেলেমেয়েদের ওপর নজর দেওয়া কেন বাপু?"

বিজু আমার কাছ থেকে চলে যায়- আমি ওসব বিশ্বাস করি না বলেই হয় তো! আমার মাথার মধ্যে বিজুর সেই শেষ কথা কেবল ভাস্‌তে লাগ্‌লো, 'কপালপোড়া'। বাস্তবিকই কি কমলার কপাল পোড়া –বিধাতাপুরুষ তার প্রতি অপ্রসন্ন? এই রুগ্ন মেয়ে প্রসব করার জন্তে দোষী কে? কমলা? একটুও নয়। আমি জানি কমলার স্বামীর দুরারোগ্য সিফিলিস্ রোগ বর্ত্তমান। একথাও জানি যে, সেই মহাপুরুষ প্রায়ই রাত্রিবেলা বাড়ী ফেরেন না। বাপ ঠাকুরদা অনেক পয়সা জমিয়ে গেছে। তাই ব্যয় করে করে সে ফুরিয়ে উঠতে পারছে না। তবুও লোকে দোষ দেবে কমলাকে। আমার স্ত্রী অন্ধ-বধির, সে অকারণ পুরুষদের প্রতি সর্ব্বদাই সদয়, কমলার স্বামীর দোষ সে দেখে না। কারণ পুরুষ পুরুষের শত্রু, আর নারী নারীর শত্রু।

এ হেন কমলা শানি হবার দিন সাতেক পরে প্রায় একটি প্রাণহীন মাংসপিণ্ড প্রসব করে। নিজের ব্যর্থতার বেদনায় মুষ্‌ড়ে পড়ে কমলা কাঁদলো, চীৎকার করলো—দু'দিন বিছানা থেকে উঠলো না, খেল না—চোখ ফুলিয়ে ফেল্‌লো কেঁদে কেঁদে। তারপর একদিন নজর প'ল শানির ওপর। শানির পানে তাকিয়ে ওর ব্যর্থতার কথা পুনরায় স্মরণ হোল, পুনরায় যেন কে ওর ক্ষতে আঘাত করলে, নিজের অজ্ঞাতসারে একটি ব্যথিত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে। আমার স্ত্রী শিউরে উঠলো। সে শানিকে নিয়ে সেখান থেকে চলে এল অযথা। সেই দিন থেকে শানিকে কমলা ভালবাসলে।

এরপর অনেক মাতুলী ধারণ করে, অনেক গ্রহ উপগ্রহকে ঘুষ দিয়ে, অনেক নির্দ্দিষ্ট গাছে ঢিল ঝুলিয়ে কমলা আবার অন্তঃসত্ত্বা হলো— আবার সে ক্ষুধিত মাতৃ-হৃদয় দিয়ে অনুভব করলে তার গর্ভস্থ ভ্রূণের সূক্ষ্ম সত্তা। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলুম, "প্রভু ওকে আর বঞ্চিত করো না, তিনি হয়তো আমার প্রার্থনায় সাড়া দিলেন। কমলার মেয়ে হোল। আবার সে তার পুরানো হাসি ফিরিয়ে পেল। মেয়েকে মানুষ করতে লাগলো বহু প্রয়াসে।

কিন্তু এ খুকীও বাঁচলো না। তার এই পৃথিবীর আবহাওয়া সইল না। এ কথা আমি আগেই বলেছি, সেই সঙ্গে আরও বলেছি যে কমলা তার শোক ভুলে আবার আমাদের শানির পানে ফিরে তাকাল, আবার তার বুকে আঘাত লাগলো, সে দু'হাত বিস্তার করে শানির দিকে ছুটে এল, আমার স্ত্রী ভাবতে লাগলো এর হাত থেকে রেহাই পাবার কথা। অগত্যা আমাকে বাড়ী বদল করবার জন্যে অনুনয় বিনয় করতে লাগলো খুবই। যেহেতু আমি ওসব অযৌক্তিক কিছু বিশ্বাস করি না—সেই জন্য আমি তার উপেক্ষা করেছিলুম।

যাই হোক কমলা একদিন জিজ্ঞেস করলে, "শানি কই ভাই ?" আমার স্ত্রী আজকাল বড় একটা শানিকে কমলার সামনে বার করে না। শানি তখন আরামে নিদ্রা যাচ্ছে। আমার স্ত্রী বল্লে, "শানির অসুখ করেছে।"

আমি পাশেই চেয়ারে বসেছিলাম। স্ত্রীর এই মিথ্যা কথা শুনে চমকে গেলুম। কমলা ভয়ার্ত্ত স্বরে বল্লে, "কি অসুখ ভাই ?"

"এই সামান্য জর।"

"ডাক্তার দেখাচ্ছো ?"

"না। দেখাবো।"

"না-ভাই দেরী কোরো না একটুও। ভালো ডাক্তার দেখাও। যে দিন কাল পড়েছে।—ফেলে রাখা একটুও উচিত নয়।"

ও চলে গেল। ওর গলার স্বর ঈষৎ কম্পিত হোল—আমি বেশ বুঝতে পারলুম। আমি স্ত্রীকে বল্লুম, "এ মিথ্যে বলে কি লাভ ?"

"তুমি থামো দিকি।" সুতরাং আমি নীরব হই আর স্ত্রী বলে চলে, "পঞ্চাশ দিন বল্‌ছি বাড়ী বদল কর, বাড়ী বদল কর। সে কথা যদি গ্রাহ্য হয়।"

তার পরের দিন দুপুর বেলা কমলা নাকি এসেছিল শানিকে দেখতে। শানির অসুখের খবর পেয়ে সে চুপ করে থাকতে পারেনি। সারাদিন সে খুকীকে কোলে করে ছিল, আমার স্ত্রীর সমস্ত বিপরীত চেষ্টা ব্যর্থ করে। আমি আসবার ঘন্টা তিনেক আগে এখান থেকে চলে গেছে। আমি অফিস থেকে ফিরে বিজুকে আর শানিকে ঐ অবস্থায় দেখলুম। বিজু বল্লে, "কি ছাই বেদানা খাইয়ে গেল। তারপর থেকে বাছা আমার কিছু মুখে করছে না।"

আমি বিজুর পানে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। সে আমার হাত দু'খানা চেপে ধরে করুণ সুরে বল্লে, "তুমি আজই বাড়ী বদল কর। নয় আমায় বাপের বাড়ী রেখে এসো। ও রাক্ষুসী আবার কালই আসবে বলে গেছে।"

আমার কানের মধ্যে কে যেন গরম সীসে ঢেলে দিলে, ঘরের মধ্যে আর কোন শব্দ নেই। সব কিছু নিথর নিস্তব্ধ। আমি বিচার কর্ত্তে বসলুম। শানির অসুখের জন্যে বাস্তবিক দায়ী কে ? কমলা না আমার স্ত্রী ? মিথ্যা একজনের বুকে আঘাত করলে, বিধাতার বিচারালয়ে তার কি কোন শাস্তি নাই ? বিধির বিধান কি নিরর্থক শব্দ সমষ্টি মাত্র ? এমন অন্ধকারে নীড় হারিয়ে একটা কাক কা-কা-কা-রবে ডেকে উঠলো। আমি শানির গায়ে কপালে হাত বুলাতে লাগলুম। আমার বেশ মনে

প'লো ক'দিন ধরে শানির অনবরত টক লেবু খাওয়ার কথা। শানির রোগের কারণ দিনের আলোয় প্রকাশিত হোল। ঐ কচি মেয়ে অত এ্যাসিড সহ্য করতে পারে? ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ছাদের ওপর একটি বিড়াল করুণ সুরে বিলাপ করতে লাগলো। সম্প্রতি তার একটি সন্তান মারা গেছে। আমার স্ত্রী চমকে উঠে আমায় অনুরোধ করলে, "আগে বেড়ালটাকে দূর করে এস—আগে ওকে দূর করে দাও।"

আমি তার অনুরোধ শুনলুম না। বিজু কাঁদলো ফুলে ফুলে, "তবে আমায় দূর করে দাও। আমি পথের ধুলো—আমি কেউ নয়—আমায় গ্রাহ্য হয় না একটুও!"

একটু সুস্থ হয়ে শানিকে ডাক্তারবাড়ী নিয়ে গেলুম। ডাক্তার এক ডোজ ওষুধ দিলে। সেটা খাইয়ে দিলুম যথা সময়ে। বিজু সারারাত্রি মেয়েকে বুকে করে নিয়ে রইলো, আর আমার অবিশ্বাস দেখে দুঃখ প্রকাশ করলে, "বললুম পীরের কাছ থেকে জলপড়া নিয়ে এস। তা হোল না। ডাক্তার-বদ্যি কি এসব সারাতে পারে?"

কিন্তু বিজুর কথাই মিথ্যা হোল। ডাক্তার আশ্চর্য্য রকমে শানিকে নিরাময় করলে। সকাল বেলা শানি আবার তার সহজ সবল পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরে পেল। আবার সে খেতে লাগলো, হাসতে লাগলো। অফিস যাবার সময় বিজুকে বললুম, "ডাইনীর হাত থেকে যখন শানি রেহাই পেল তখন কমলাকে ক্ষমা করো।"

বিজুর যেন অসহ্য হোল আমার কথা, বল্‌লে, "মাইরি বলছি, তুমি আমায় পাগল করে দেবে। কালকের মধ্যে যদি না বাড়ী বদলাও, তা'হলে সত্যি সত্যি আমি বাপের বাড়ী চলে যাবো।"

অগত্যা সেই শনিবার দিনই রাত্রে বাড়ী ঠিক করে ফিরলুম। পরের দিন জিনিষপত্র নিয়ে উঠে গেলুম নতুন বাসায়। পরের জন্যে—স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে সংসারের শান্তি নষ্ট করতে আমি নারাজ।

বুধীর বাড়ী ফেরা

ঘোর দুঃস্বপ্ন হইতে বুধী জাগিয়া উঠিল।

সে একটু ঘুমাইয়াছিল কি? হয়তো তার খেয়াল নাই।

এ কোন ভীষণ জায়গায় তাহাকে আনিয়া ফেলা হইয়াছে? চারিদিকে বিশ্রী ইটের দেওয়াল ও ময়লা···ময়লা···অপরিষ্কার মেঝে। একটু আলো বা হাওয়া আসিবার উপায় নাই। আর কি ভীড়! এত ভীড়, এত ঠাসাঠাসি বুধীর জীবনে কখনো দেখে নাই—এত ভীড়ে আর এই গুমট গরমে প্রাণ যে তার বাহির হইয়া গেল! এত ভীড়ে, এই ঠাসাঠাসির মধ্যে কি ঘুম হয়?

নতুন নতুন অপরিচিত মুখ। কাহাকেও সে দেখে নাই···নিষ্ঠুর, লোভার্ত্ত মুখ, বুধী দেখিলেই বুঝিতে পারে···বুঝিতে পারিয়া বুধীর গা শিহরিয়া ওঠে···মনে যে কি দুঃখ আর অস্বস্তি বোধ হয়।

সে বেশ বোঝে এখানে কেহ তাহাকে ভালবাসে না, যেমন সেই ছোট খুকী তাহাকে ভালবাসিত, যত্ন করিয়া খাওয়াইত, গলা ধরিয়া কত আদরের কথা বলিত।···কোথায় গেল ছোট খুকীটা? কেন তাহাকে এখানে আনা হইয়াছে, কেন আনা হইয়াছে তাহা সে বুঝিতেই পারে না। কেবল সে এইটুকু জানে কতদিন ধরিয়া দীর্ঘ, কঠিন পা বাহিয়া তাহাকে এখানে আসিতে হইয়াছে—সঙ্গে বহু সঙ্গী ছিল, কিন্তু

অপরিচিত, কারো সঙ্গে বুধীর আলাপ হয় নাই তেমন, আলাপ করিবার মত মনের অবস্থাও তাহার ছিল না।

কেহ যত্ন করিয়া তাহাকে খাওয়ায় নাই। এখানকার খাবার মুখে দেবার উপায় নাই। কেমন যেন ভ্যাপসা গন্ধ, ভাল আস্বাদ তো নাই-ই, ভাল গন্ধ পর্য্যন্ত নাই খাবারের। বুড়ী তাহাকে যত্ন করিয়া খাওয়াইত, একথা অস্বীকার করিতে পারিবে না। হয়তো সে ছোট খুকীর মত ভালবাসিত না অতটা—কিন্তু সন্ধ্যার সময় পেট পুরিয়া খাইবার ব্যবস্থা করিতে কখনও ক্রটী করে নাই।

সত্যি, এ যে কোন্ জায়গায় আনিয়াছে, তাহার আদৌ কোনো ধারণাই নাই। এমন অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর জায়গা তার অভিজ্ঞতার বাহিরে ছিল এতদিন। কি হট্টগোল, নানারকম নতুন নতুন বিকট বিকট শব্দ জায়গাটাতে! তাহার মন আরও পাগল হইয়া উঠিল এ শব্দে ও আওয়াজে। জীবনে কখনো এত অদ্ভুত ধরণের সব আওয়াজ সে শুনে নাই। অথচ তাহার বয়েস কম হয় নাই। বুধীর জীবন কাটিয়াছে এই বিশ্রী জায়গা হতে বহু দূরে। কত দূর তাহার ঠিক ধারণা নাই, কিন্তু মোটের ওপর বহু, বহু দূরে অন্য এক স্থানে যেখানে অবারিত সবুজ মাঠ আছে, অপূর্ব্ব সুঘ্রাণে ভরা কোমল, সরস ঘাসে ঢাকা, কি সুন্দর স্বাদ সে ঘাসের! মাঠের ধারে কলস্বনা নদী, নদীর কিনারায় জলের ধার পর্য্যন্ত নানা জাতীয় ঘাসের ও জলজ শাকের বন—ঠাণ্ডা, নরম তাজা—কি অপূর্ব্ব তাদের সুগন্ধ। স্বাদ তো আছেই ভালো কিন্তু সেই নতুন-ওঠা বর্ষা-সতেজ কচি ঘাস ও কলমীলতার তাজা গন্ধের কথা যখনই মনে হয়, যখন মনে পড়ে এক হাঁটু দীর্ঘ, ঘনশ্যাম তৃণরাজির মধ্যে মুখ ডুবাইয়া পেট ভরিয়া সে তৃপ্তির ভোজ—হু-হু উন্মুক্ত বাতাস ও দূরপ্রসারী প্রান্তরের মধ্যে সে মুক্তির আনন্দ—তখন বুধী সত্যই ক্ষেপিয়া যায়—তাহার জ্ঞান থাকে না। মুক্তির জন্য সে উন্মাদ হইয়া

উঠে। জীবনের বহুদিন সেখানে সে কাটাইয়াছে। বহুদিন। কত দিন তাহা সে জানে না। বয়স তো তার কম হয় নাই···প্রথম জীবনের কথা প্রায় কিছুই তাহার মনে নাই—যা একটু আধটু মনে পড়ে—সব আব্‌ছায়া, ধোঁয়া—কেবল খুব বড় বড় সবুজ মাঠ, তলায় ফল-বিছিয়ে থাকা বড় বড় গাছ, সুপেয় শীতল স্রোতের জল, সাঁজালের ধোঁয়ার মৃদু গন্ধ-ভরা আবাসস্থান—এই সব মনে পড়ে।

আজকাল কিন্তু বেশী করিয়া মনে পড়ে, ছোট খুকীর কথা—খুকী তাহাকে সত্যই ভালবাসিত।

এটা কোন্ জায়গা? এক একবার বুধীর মনে হয় হয়তো বা এটা পাউণ্ড ঘর। কিন্তু বুধী জীবনে তো কতবার পাউণ্ড ঘরে কত বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছে—এ ধরণের পাউণ্ড ঘর তো দেখে নাই! সেখানে তো বাঁশের বেড়া ঘেরা খোলা জায়গায় তাহাকে থাকিতে হইয়াছে, মাথার ওপর সেখানে নীল আকাশ, সবুজ গাছপালাও চোখে পড়ে, পাখীর ডাকও শুনা যায়—এমন বিশ্রী আওয়াজ তো সে সব জায়গায় শুনে নাই। এমন কঠিন ইঁটের দেওয়াল দিয়া ঘেরা নয় সে জায়গা।

পাখীর কথায় বুধীর মনে পড়িল অনেকদিন আগেকার এক ঘটনা। কতদিন আগে তাহা সে বলিতে পারিবে না। মাঠের ধারে সে ঘাস খাইতেছিল; একটা কি পাখী বনের ডাল হইতে উড়িয়া আসিয়া তাহার শিংএর উপর বসিল। শিংএর উপর পাখী বসা সে পছন্দ করে না—সুতরাং শিং নাড়া দিতেই পাখীটা উড়িয়া বসিল তাহারই সামনেকার উলুঘাসে ভরা বাচড়ার উপর। তখন উলুঘাসের শীষ গজাইয়াছে, শীষের মাথায় সাদা সাদা ফুল অজস্র অজস্র। পাখীটা সেই উলুফুলের মধ্যে বসিয়া পালক ফুলাইয়া পায়চারী করিতে লাগিল।

কি সুন্দর গায়ের রং, কি নরম নরম রঙীন পালকের বোঝা তার গায়ে, কেমন রঙীন ঠোঁটখানি।

বুধীর মন সুন্দর পাখীটার প্রতি ভালবাসায় ভরিয়া গেল। সুতরাং খানিকটা পরেই যখন পাখীটা আবার তার শিংএর উপর চড়িয়া বসিল, এবার আর সে শিং নাড়া দিল না। এই রকম করিয়া পাখীটার সঙ্গে তাহার ভাব জমিয়া গেল। পাখীটার ভাষা ছিল তার শিংএর উপর চটুল পা দুইখানির নাচুনি—কত নির্জ্জন রৌদ্রভরা দুপুরে বুধী হয়ত মাঠে দাঁড়াইয়া উত্তাপে ও তৃষ্ণায় ঝিমাইতেছে—অমনি ছোট্ট পাখীটা নিকটবর্তী বনভূমি হইতে উড়িয়া তাহার শিংএ আসিয়া বসিত। বুধীর নিঃসঙ্গতা অমনি দূর হইয়া যাইত—তাহাদের কত কথা, কত গল্প চলিত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত—তারপর নামিত অন্ধকার। বুড়ী আসিয়া খোঁটা উপড়াইয়া তাহাকে বাড়ী লইয়া যাইত—পাখী যাইত উড়িয়া॥ একদিন সেই মাঠে ফাঁদ পাতিয়া কাহারা পাখী ধরিতে আসিল পোষা ডাহুকের ডাক শুনিয়া বন্য পাখীটা খাঁচার নিকটে যাইতেই ফাঁদে পড়িয়া গেল। শিকারীরা তাহাকে খাঁচায় পূরিয়া লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে ছোট পাখীটার কি করুণ আর্ত্তনাদ।

মাঝে মাঝে বুধীর সন্তান হইত। বেশ ছোট ছোট বাচ্চাগুলি ছুটিয়া, লাফাইয়া, নাচিয়া বেড়াইত সারা মাঠ। প্রথম প্রথম তাহাদের বড় ভাল লাগিত কিন্তু বড় হইয়া গেলে তাহারা কোথায় চলিয়া যাইত—তাহাদের কথা বুধীর আর বড় একটা মনে পড়িত না।

···কত কথাই মনে হয়। এই বিকট আওয়াজে ভরা নোংরা, কুশ্রী ইঁটের দেওয়ালে ঘেরা এই জায়গাটা—আজ ক'দিন আসিয়া সে মরিয়া যাইতেছে···আর একটা ব্যাপার···

বুধী রক্তের গন্ধ পায় কেন এখানে! সন্দেহের সহিত সে চারিদিকে

চাহিয়া দেখিয়াছে, কিছু টের পায় নাই, তবে দূর হইতে রক্তের গন্ধ ভাসিয়া আসে তাহা সে বেশ বুঝিতে পারে।

প্রথম প্রথম তাহার মনে হইত—এও এক ধরণের পাউণ্ড ঘর—একদিন বুড়ীর ছেলে আসিয়া তাহাকে বাড়ী লইয়া যাইবে। কিন্তু পাউণ্ড ঘরের অভিজ্ঞতা হইতে বুধী জানে যে সেখানে একদিন বা বড় জোড় ছু'দিন থাকিতে হয়—তার পরেই বুড়ীর ছেলে আসিত দড়ি হাতে তাহাকে বাড়ী লইয়া যাইতে। আর এখানে আসিয়াছে আজ পাঁচ ছ'দিন কি তারও বেশী। না—এ পাউণ্ড ঘর নয়, তার চেয়েও গুরুতর বিপদে এবার সে পড়িয়াছে।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। আর একটা জিনিস বুধী লক্ষ্য করিয়াছে আজ ক'দিন। প্রতিদিন বৈকালে ছু'জন লোক আসিয়া এই গরুর ভীড়ের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি গরুর গায়ে কি ছাপ মারিয়া যায়—পরদিন শেষ রাত্রের দিকে সেই গরুগুলিকে কোথায় যেন লইয়া যায়—আর তারা ফেরে না।

কেন ফেরে না, কোথায় যায় তারা ?

আর ঐ রক্তের গন্ধটা···তাজা রক্তের গন্ধ। যেদিন বাতাস ওই কোণ হইতে বয়, সেদিন রক্তের গন্ধটা আসে। ভয়ে, সন্দেহে বুধীর মন উড়িয়া যায়। সাথী, ছোট খুকী···কতদিন তোমাদের সাথে দেখা হয় নাই, বন্ধু হিসাবে আসিয়া এ বিপদ হইতে উদ্ধার করো। এমন বিপদে জীবনে কখনো সে পড়ে নাই।

এই সব সাত পাঁচ ভাবিয়া বুধীর রাত্রে ভাল ঘুম হইল না। এদিকে সকাল বেলা হইতেই চারিধারের বিকট আওয়াজ সুরু হইল। বুধীর সঙ্গেই একটি অল্পবয়স্ক প্রতিবেশী আজ কয়েক দিন ধরিয়া আছে, প্রথম প্রথম বুধী তাকে তত পছন্দ করিত না। সে যেন একটু বেশী চাল দেখাইতে চায়—বুধী পাড়াগেঁয়ে বলিয়া যেন তাহাকে আমল দিতেই

চাহিত না। কিন্তু এ ভয়ঙ্কর নির্বান্ধব স্থানে চাল কদিন খাটে? শীঘ্রই তাহার অল্পবয়স্ক প্রতিবেশীটিকে সমস্ত চাল বিসর্জ্জন দিতে হইল।

একদিন বুধী দেখিল সে কাঁদিতেছে!

বুধীর মনে কষ্ট হইল। আহা ছেলেমানুষ! তাহার প্রথম সন্তান এতদিন ওই বয়সের হইয়াছে—বড় হইলে বুধী তাহাকে আর দেখে নাই! কে জানে কোথায় গিয়াছে! বাঁচিয়া আছে কি না তাই বা কে জানে?

সহানুভূতি প্রকাশ করিবার উপায় নাই। বুধীর ইচ্ছা হইল সঙ্গীটির সে গা চাটে। কিন্তু দু'জনের মধ্যে তারের বেড়া। বুধী তবুও তাহাকে যতদূর সম্ভব সান্ত্বনা দিয়াছিল সেদিন। ছেলে মানুষ, বেশ নধর গড়ন, তবুও এই ভয়ানক স্থানে পেট ভরিয়া না খাইতে পাইয়া রোগা হইয়া গিয়াছে।

সেই হইতে দু'জনে বেশ ভাব। আজ সকালে উঠিয়া বুধী তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, সে খাবার খাইতেছে। ছেলে-মানুষ, খাইবার লোভই বেশী।

খাওয়া শেষ করিয়া তাহার তরুণ বন্ধু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল—হাম্বা-আ-আ!

বুধী বলিল—চুপ করো। ছিঃ মন খারাপ করো না। কিন্তু তাহার নিজের মন দিয়া তো বুঝিতেছে, কি দারুণ অশান্তিতে কাটিতেছে এখানে! তবুও ছেলে-মানুষকে মিথ্যা সান্ত্বনা দেওয়াও ভালো!

বুধী বলিল—খাও খাও। যা পড়ে আছে, ও' দুটি খেয়ে ফেল। এমন সময়ে দুজন যমদূতের মত লোক তাহাদের কাঠরায় ঢুকিল। বুধীদের কাঠরায় তাহারা প্রায় জন কুড়ি আছে। এই কুড়ি জনের অধিকাংশই প্রৌঢ় বয়স্ক। একজন তো আছে, বৃদ্ধের দলে তাকে অনায়াসেই ফেলা চলে।

এদের মধ্যে বুধীর বন্ধুটি অল্পবয়স্ক এবং বেশ নধর দেখিতে। যমদূতের মত লোকদু'টি তাহার গায়ে কি একটা ছাপ মারিয়া চলিয়া গেল—কাঠরায় আরও দু'টি প্রৌঢ় সঙ্গীর গায়েও তাহারা ছাপ দিল। একটু পরে দু'জন লোক আসিয়া কাঠরায় ঢুকিল এবং ছাপ-মারা সঙ্গীগুলিকে দড়ি খুলিয়া কোথায় যেন লইয়া গেল।

সকাল গড়াইয়া দুপুর, দুপুর গড়াইয়া বৈকাল হইয়াছে। বুধীর তরুণ বন্ধু ফিরিল না। ছাপ-মারা সঙ্গীদের কেহই ফিরিল না। বুধীর মনে ভয়ানক সন্দেহ হইল—সেই সঙ্গে কি একটা অজানা ভয়ে ওর গলা পর্যন্ত শুকাইয়া উঠিল। সেই রক্তের গন্ধ···টাটকা তাজা রক্তের গন্ধ··· এখানে কোণাকুণি হাওয়া বহিলেই যেটা পাওয়া যায়—সেই গন্ধের কথা হঠাৎ মনে আসিতেই ভয়ে আতঙ্কে বুধীর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। ভয়ে মরিয়া হইয়া সে গলার দড়িতে এক হেঁচকা টান মারিতেই সেটা গেল ছিঁড়িয়া।

বুধী উন্মাদের দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল। কাঠরায় ঢুকিবার কাঠের মোটা গরাদে বসানো নীচু ফটক্টা বন্ধ। নিকটে কেহ কোথাও নাই! পাড়াগাঁয়ে সে 'মানুষ' উঁচু উঁচু বাশের বেড়া টপ্‌কানো তার আজীবন অভ্যাস—এক লাফে ফটক্টা ডিঙ্গাইয়া সে কাঠরার বাহিরে আসিল। তারপর বড় উঠান পার হইয়া বড় ফটকের নিকট পৌছিল—সেটাও খোলা। সে ছুটিতে ছুটিতে বড় ফটকটাও পার হইয়া গেল।

পরবর্ত্তী পনর মিনিটের কথা তাহার ঠিক স্পষ্ট মনে নাই—চওড়া রাস্তা—লোকের ভীড়—বড় বড় কি এক ধরণের গাড়ী রাস্তা দিয়া ছুটিতেছে—বড় বড় বাড়ী—একটা খাল—একটা পুল—আরও লোকজন —একজোড়া মহিষ—সেই বিকট আওয়াজ সর্ব্বত্র—দিশাহারার মত ছুটিতে ছুটিতে বুধী রাস্তার পর রাস্তা পার হইতে লাগিল—কত রাস্তা! এদেশে রাস্তার কি শেষ নাই? আবার বাড়ীঘর—আবার রাস্তা—দু'দুবার

সে গাড়ী চাপা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল!—আবার বড় একটা পুল—দূরে রেলগাড়ী যাইতেছে—রেলগাড়ী সে চেনে—তাহাদের গ্রামে দক্ষিণ মাঠে ট্যাংরার ধান ক্ষেতের মধ্যে দিয়া বাঁধা উচু সড়ক বাহিয়া রেলগাড়ী যায়।

এখানে উপরে রেলরাস্তা—নীচে দিয়া রাস্তা—ছুটিয়া পুলের তলা দিয়া সে রেলরাস্তাও পার হইল।—আবার দৌড়। দৌড়! বৃদ্ধ শরীর, সে হাঁপাইয়া পড়িল। যখন তাহার দিশেহারা ভাবটা কাটিয়া জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে, তখন সে দেখিল একটা জলার ধারে খুব বড় মাঠের মধ্যে সে একা দাঁড়াইয়া। সামনের প্রকাণ্ড জলাটি কচুরী পানায় বোঝাই, সেখান দিয়া পথ বন্ধ। আর ভীড় নাই, রাস্তার গোলক ধাঁধা নাই, গাড়ীর ঘড়ঘড় আওয়াজ নাই। এখানে অনেক দূর পর্য্যন্ত আকাশ দেখা যাইতেছে—হু হু হাওয়া বহিতেছে জলার দিক হইতে··· যেন তাহাদের গ্রামের নদীর ধারের মাঠের মত।

মুক্ত! মুক্ত! সে মুক্ত!

তবুও নিজেকে সে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিতে পারিল না—স্থির হইয়া এক জায়গায় দাঁড়াইতে পারিল না। কি জানি যদি লোকজন আসিয়া আবার তাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া সেই পাচীল ঘেরা বড় বাড়ীটায় পুরিয়া রাখে!

বহু ঘুরিয়া পরে সে ক্লান্ত হইয়া একটা গাছতলায় রাত্রির জন্য আশ্রয় লইল। সে শুইয়া পড়িল একেবারে - কোনদিকে লোক নাই, তবু সে ভাল ঘুমাইতে পারিল না। যখন ঘুম ভাঙিল, তখন ভোর হইয়াছে। সে চলিতে আরম্ভ করিল। দুপুর পর্য্যন্ত দিকভ্রান্তের মত এদিক ওদিক কতদিক ঘুরিতে ঘুরিতে একটা গাছের তলায় দাঁড়াইয়াছে, হঠাৎ তাহার মনে হইল দূরে যে বড় রাস্তা চলিয়া গিয়াছে,

—যার দু'ধারে বড় বড় গাছের ছায়া—ওই রাস্তা সে ইতিপূর্ব্বে আর আর একবার দেখিয়াছে !

সেদিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিতে তাহার মনে পড়িল—অদ্ভুতভাবে পুরাণো স্মৃতিটা মনে পড়িল হঠাৎ !

ওই রাস্তাটা দিয়াই তাহাদের একটা বড় দলের সঙ্গে সে আসিয়াছিল মাসখানেক আগে ! সেই রাস্তাটা !

বুধী ছুটিয়া গিয়া বড় রাস্তাটায় উঠিল। হাঁ, সে ঠিক চিনিতে পারিয়াছে. সেই রাস্তাটাই তো ! কোনো ভুল নাই। সে অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া রহিল—মুক্তি মিথ্যা, এত প্রচুর নরম কচি ঘাস মিথ্যা, নীল আকাশের তলায় বড় বড় মাঠের নিরঙ্কুশ, নিরাপদ নির্জ্জনতা আর হু হু উন্মুক্ত হাওয়া সব মিথ্যা—যদি সে তাহার আজন্ম সুপরিচিত সেই গ্রামটিতে না ফিরিতে পারে, ছোট্ট খুকীর দু'টি ছোট্ট স্নেহ হস্তের স্পর্শ পুনরায় সে না পায়।

জীবনপণ—বুধী যে করিয়াই হউক, তাহার গ্রামে তাহার খুকীর কাছে ফিরিয়া যাইবেই !

একটা পথ-চলতি পাটার গাড়ী হইতে একটা বিচুলির আঁটি পড়িয়া গেল—বুধী গিয়া সেটা মুখে তুলিয়া লইল। শুধুই একঘেয়ে সবুজ ঘাস খাইতে কি মুখে ভাল লাগে ? মাঝে মাঝে এই ধরণের সুখাদ্য খাইয়া মুখ বদলাইয়া লইতে হয় বৈকি ! তারপর বুধী সোজা রাস্তা বহিয়া চলিল—একদিন, দু'দিন, তিনদিন। খাদ্যের ভাবনা নাই—দু'ধারে মাঠ সবুজ হইয়া উঠিয়াছে, নববর্ষায় সুন্দর নিবিড় সবুজ ঘাসে ও আউশ ধানের জাওলায়। আমন ধান আজও রোয়া হয় নাই। জলেরও নাই অভাব, রাস্তার দু'দিকের খানায় প্রচুর টাটকা বৃষ্টির জল।

যাইতে যাইতে একদিন একটা মজার ঘটনা ঘটিল। একটা

গাছতলায় দুপুর বেলা সে বিশ্রাম করিতেছে—একটা ছেলে আসিয়া গলায় দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে লইয়া চলিল হঠাৎ। বুধী তো অবাক!

ছেলেটি তাহাকে একটি গ্রামের মধ্যে একটি খড়ের ঘরে—সেখানে লইয়া গিয়া খুঁটির গায়ে বাঁধিল। বাড়ীতে তখন কেহ নাই—ছেলেটিও কোথায় চলিয়া গেল। বুধী লক্ষ্য করিল একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ঘরের দাওয়ায় বসিয়া আপন মনে কি বকিতেছে, আর দুলিতেছে। বাড়ীর উঠানে একটি খেজুর গাছ, একটা পেয়ারা গাছ, বাড়ীর পেছনে একটা ডোবা। একটু পরে একটা বৌ ডোবা হইতে একরাশ বাসন মাজিয়া আনিয়া দাওয়ার এক কোণে নামাইয়া বৃদ্ধাকে বলিল—তুমি একটু চুপ করবে কি না সকালবেলা, আমি জিগ্যেস্ করি। বাড়ীর সবাই পাগল, পাগলা গারদের মধ্যে থেকে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেচে, আর পারিনে বাবু, মরণ হোলেও বাঁচতাম! ফের তুমি যদি ওরকম বকবে মা, তবে হাঁড়ি কুড়ি থাকবে পড়ে, ভাতের পিণ্ডি কে খেতে দেয় দেখবো এখন আজগে! এই সময় বুধীর দিকে নজর পড়িতে বৌটি বলিল—ছেলেটা বুঝি গরুটা এনেচে তা' হোলে! বাবা! কাল থেকে কি কম খোসামোদটা করচি ওকে? গরুটা হারালো দ্যাখ কোথাও কেউ পণ্টে পাঠালে, কি কেউ বেঁধে রাখলে—তা আমার কথা কি কেউ—গরুটারও হাল হয়েচে দ্যাখো—

কথা বলিতে বলিতে তাহার সামনে আসিয়া বৌটি বলিয়া উঠিল—এ তো আমাদের নয়!······কার আবার পরের গরু ধরে এনেচে দ্যাখো! নাঃ, ছেলেটাকে নিয়ে আর পারি নে—এ যেন মনে হচ্চে ও পাড়ার ভুবনের মার গরু—মাগী এসে আমায় চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করবে এখন, যদি টের পায়—

বৌটি তার গলার দড়ি খুলিয়া তাহাকে কিছু দূর তাড়াইয়া উঠানের বাহির করিয়া দিল—সম্ভবতঃ এই জন্য যে, ভুবনের ম

এখন হঠাৎ আসিয়া পড়িলে গরু যে এখানেই বাঁধা ছিল, ইহার কোন চিহ্ন না পায়।

গ্রামের বাহিরে এক জায়গায় প্রকাণ্ড বড় একটা গাছ। গাছের তলায় সে একটু দাঁড়াইল। চারিদিকে মাঠ, কচি কচি আউশের জাওলায় মাঠ ঘন সবুজ, বুধীর ভয়ানক লোভ হইল, মাঠে নামিয়া সে ধান-গাছ খায়—কিন্তু বিদেশ, বিভুঁই জায়গা, যদি এখানে পাউণ্ড ঘরে দেয়—তবে কে আসিয়া পয়সা দিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবে? না—সে কোথাও আর আবদ্ধ থাকিতে চায় না। উঃ, বুকের রক্ত হিম হইয়া যায়, এখনও সেই বড় বাড়ী, সেই উঁচু পাঁচীল, সেই গরাদওয়ালা কাঠরা, সেই বিশ্রী আওয়াজ—সকলের ওপর, সেই রক্তের গন্ধের কথা মনে উঠিলে···!

মুক্তির আনন্দ আজ নবযৌবনের সঞ্চার করিয়াছে বুধীর দেহে—সে ভুলিয়া গিয়াছে তাহার বয়েস আটারো উনিশের কম নয়—সে প্রৌঢ়া, সাত আটটি সন্তানের জননী, তার ওপরে গত পনর কুড়ি দিনের উদ্বেগে, কষ্টে, উপবাসে শীর্ণদেহা···তার স্নায়ুতন্ত্রীও ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে—তার মনে বল নাই···শরীরে সামর্থ্য নাই···

কিন্তু উদার নীল আকাশে প্রভাতের সূর্য্য উঠিয়াছে, যেমন উঠিত তাহার জন্মভূমিতে, পাখীরা কলধ্বনি করিতেছে, যেমন করিত তাহাদের নদীর ধারের মাঠের অনেক দিনের সেই পক্ষী বন্ধুটি, বাঁশতলায় প্রথম বর্ষার জলে পুষ্ট হইয়া পিপুল লতা বাড়িয়া উঠিয়াছে, অনন্তমূলের চারা বাহির হইয়াছে, গ্রামে গ্রামে 'বৌ-কথা-কও' পাখীর সেই সুন্দর আবাল্য পরিচিত ডাক···সম্মুখে অনেক দূরে কোথায় তাহাদের গ্রামখানি, ছোট্ট নদীটা—সুগন্ধি অনন্তমূলের কচি পাতার কি চমৎকার আস্বাদ! ···এই ত জীবনকে সে আবার খুঁজিয়া পাইয়াছে···কত কালের পরে মুক্তি আসিয়াছে···এখন মরিলেও তার দুঃখ নাই—শিয়াল শকুনে তার

জীর্ণ দেহটা খাইয়া ফেলিলেও দুঃখ নাই—তবে ছোট্ট খুকীটাকে একবার দেখিয়া সে মরিবে—

আবার সে রাস্তা খুঁজিয়া বাহির করিল—এই মাঠের ধারেই একদিন তাহার দলের সঙ্গীদের সঙ্গে, এই গাছতলায় রাত্রে শুইয়াছিল বটে। যাহারা তাহাদের তাড়াইয়া আনিতেছিল, এই গাছতলাতেই তাহারা রাত্রে রাঁধিয়া খাইয়াছিল।

আবার পথ···চলিয়াছে, চলিয়াছে···পথের শেষ নাই—প্রভাত, দুপুরে পরিণত হইল—দুপুর গড়াইয়া বিকাল হইল। ক্ষুধা পাইয়াছিল, এক জায়গায় পথের ধারে ছোট বিল—বিলের ধারে ভারী চমৎকার সবুজ ঘাস! বুধীর লোভ হইল—সে রাস্তা হইতে নামিয়া বিলের ধারে গেল—নরম কচি ঘাসে মুখ ডুবাইয়া সে গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল।

বিলের ধারে আরও কয়েকটি গরু চরিতেছিল।

একজন বলিল—এ বুড়ী কোত্থেকে এসে জুটলো হে? একে ত চিনিনে!

আর একজন বলিল—চেহারা দেখ না—যেন কসাইখানার ফেরতা! হাড়-পাঁজরা গুণে নেওয়া যাচ্চে! মরি মরি কি যে রূপ! বলি, ওগো, তোমার বাড়ী কোথায়?

ইহারা বুধীর সন্তানের বয়সী, ইহাদের ফাজলামী তাহার ভাল লাগিল না। সে কথার কোন উত্তর না দিয়া গম্ভীর মুখে আপন মনে ঘাস খাইতে লাগিল। নিজের মান নিজের কাছে। তাহাতেও নিস্তার নাই। বেয়াদব ছোকরা আগাইয়া আসিয়া বলিল—বলি, কথা বলচো না কেন বুড়ী? কসাইখানা থেকে পালিয়ে আসচো নাকি? এমন চেহারা কেন? হঠাৎ বুধীর ভয় হইল। কসাইখানা কি জিনিস? পালাইয়া তো আসিয়াছেই বটে—আর সে সেখানে দাঁড়ানো নিরাপদ

মনে করিল না। লোভনীয় কচি ঘাসগুলি ফেলিয়া ছুট দিয়া রাস্তার ওপর আসিয়া উঠিল।

পিছন হইতে একজন বলিয়া উঠিল—আরে বাবা, কোথাকার অসভ্য জানোয়ার! ভদ্রলোকের কথায় উত্তর দিতে হয় তাও জানে না?

চলিতে চলিতে একদিন বুধী কি করিয়া বুঝিতে পারিল সে ভুল পথে চলিতেছে। এ রাস্তা বাহিয়া এতদূর সে আসে নাই। মাঠের মধ্যে একটা কাঁচা রাস্তা কোথা দিয়া যেন নামিয়া গিয়াছিল—সেই মেটে রাস্তা দিয়া আসিয়া সেবার তাহাদের দল উঠিয়াছিল বড় রাস্তাটায়। বুধী ঠিক ঠাহর করিতে পারে নাই, কোথায় সেই মেটে রাস্তা বড় রাস্তা হইতে নামিয়া গিয়াছে।

ঠিক তাহাই ঘটিল। সম্মুখে একটা নদী পড়িল। এ নদী সে দেখে নাই। সে পথ ভুল করিয়াছে।

সে বড় রাস্তা হইতে নামিয়া পড়িল—মাঠের মাঝখান বহিয়া কত সরু সরু রাস্তাই চলিয়াছে—এর একটাও পূর্ব্ব পরিচিত নয়। কতক-গুলি গন্ধও কতকগুলি বিশেষ ছবি বুধীর মনে আছে সেই আগের রাস্তাটা সম্পর্কে। সে ছবি ও সে গন্ধের সঙ্গে এ রাস্তা খাপ খাইতেছে না। একটা প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে সে ক্রমে আসিয়া পড়িল। দিশাহারা হইয়া গিয়াছে সে। আর কোন কিছুরই ঠিক নাই তার। এসব জায়গায় কখনও সে আসে নাই, এসব পথে হাঁটে নাই।

মাঠের মধ্য দিয়া অন্যমনস্কভাবে উদ্‌ভ্রান্তের মত চলিতে চলিতে হঠাৎ ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ শুনিয়া চমকিয়া পাশের দিকে চাহিল। একটা মস্ত বড় আলকেউটে ফণা বিস্তার করিয়া দুলিতেছে। ছোবল মারিবার দেরী চক্ষের পলক মাত্র—বুধী থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া বিদ্যুৎবেগে পিছু হাঁটিয়া আসিল—পরক্ষণেই দৌড় দিল খানা, ডোবা, পগার ভাঙ্গিয়া।

কেউটেটা কিছুদূর তাহার পিছু পিছু আসিয়া একটা কাঁটাঝোপে আটকাইয়া থামিয়া গেল।

কাঁটাঝোপের ওপাশেই একটা ছোট্ট ডোবাতে দু'টি ছেলে-মেয়ে ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিতেছে। বুধী হুট্‌পাট্‌ করিয়া তাহাদের সামনে গিয়া পড়িতেই তাহারা ভয়ে ছিপ ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বুধী মানুষ দেখিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল অনেক আগেই। সাপটা দেখা যায় না পিছনে, চকিতে পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল।

মেয়েটি ছেলেটির হাত চাপিয়া ধরিয়া বড় বড় ভয়ার্ত্ত চোখে বুধীর দিকে চাহিয়া বলিল—ও দাদা, গুঁতিয়ে দেবে—কাদের গরু।

আহা, তাদের গ্রামের তার বন্ধু সেই খুকীটির মত। স্নেহে বুধীর মন গলিয়া গেল। বুধী বলিতে চাহিল—গুঁতিয়ে দেবো কেন, খুকী—সোনা আমার, মাণিক আমার—আমি কিছু বোলবো না—ভয় কি? ধরো, তোমরা মাছ ধরো।

ছেলেটি ছিপ উঁচাইয়া মারিবার ভঙ্গিতে বলিল—যাঃ বেরো—যাঃ—এ আপদ কোথা থেকে এসে জুটলো আবার যাঃ—যাঃ—

বুধীর ইচ্ছা ছিল কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ওদের মাছ ধরা দেখে—খুকীটাকে দেখে। কিন্তু খুকীর দাদা ছিপ গুটাইয়া দাঁড়াইয়া আছে, মারিবে বোধ হয়। সেখান হইতে সে সরিয়া পড়িল।

নিকটে একটা গ্রাম। কাহাদের বাড়ীর উঠানে প্রকাণ্ড এক বিচালির গাদা। উঠানে বড় বড় নাদায় কতকগুলি গরু খোল-মাখা বিচালি ও ভূষির জাব্‌ খাইতেছে। প্রকাণ্ড নাদাগুলি হইতে উত্থিত সুমিষ্ট খোলের গন্ধে বুধীর জিহ্বা জলসিক্ত হইয়া উঠিল। শুধু ঘাস অর জল, জল আর ঘাস···সেখানে সেই বড় বাড়িটাতে বন্দীশালায় থাকিবার সময় শুক্‌নো বিচালী খাইয়া মরিয়াছে কতদিন।

খোল মাখানো জাব্‌ কতকাল সে যে খায় নাই!

বুধীর বড় লোভ হইল—সে দেখিল একটা ছোট নাদায় দু'টি বাছুর জাব্ খাইতেছে। এই তাহার সুযোগ—সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—উঠান-টাতে লোক নাই—অন্ধকারও বেশ ঘন। বুধী চট্ করিয়া বাছুরের পাশে আসিয়া নাদাটাতে মুখ ডুবাইয়া খাইতে আরম্ভ করিল। আঃ কতকাল পরে খোল-মাখা জাবের আস্বাদ আবার সে পাইল!...

ছোট বাছুরটা বিস্মিত ও ভীত হইয়া ডাকিল—মা—আ—আ। কে এসে খাচ্ছে দেখ—

কিছু দূরের নাদাটা হইতে মুখ তুলিয়া তাহার মা বুধীকে দেখিতে পাইয়া বলিল—কে রে? দূর হ—দূর হ—আপদ—

কথা শেষ করিয়াই বাছুরের মা শিং নাড়া দিয়া বুধীকে গুঁতাইতে আসিল। বুধী তখন মাত্র কয়েক গ্রাস খাইয়াছে—ভয়ে সে খাওয়া ফেলিয়া দৌড় দিল।

একটা বড় গরু বলিয়া উঠিল—আস্পর্দ্ধা ছাখো না ভিসিবীটার!...

বুধী বড় অপমান বোধ করিল। জগতটা যে এত খারাপ তাহা সে আগে জানিত না। এতটুকু সহানুভূতি সে স্বজাতীয়ের কাছে আশা করিতে পারে না? আবার ভিসিবী বলিয়া অপমান করা? গ্রামের বাহিরে আসিয়া সে হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে জগৎ কি নিষ্ঠুর! তখন অন্ধকার খুব ঘন হইয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, গাছপালার মধ্যে জোনাকী জ্বলিতেছে। মশায় খাইয়া ফেলিয়া দেয় বলিয়া বুধী এই সব গাছতলায় শুইতে পারে না যেখানে সেখানে। সারাদিনের পরিশ্রমে শরীর তাহার ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিতেছে। বরাবর তাহার সাঁজালের ধোঁয়ায় শোয়ার অভ্যাস। এই সময়ে প্রতিদিন মনে পড়ে তাহার আবাল্য পরিচিত নিজস্ব গোহাল ঘরটির কথা। তাহার ক্ষুদ্র জগতের কেন্দ্র সেখানে। সেই তাহার গৃহ। আজ তারই অভাবে সে গৃহহীন,

ছন্নছাড়া হইয়া পথে পথে বেড়াইতেছে। আর কখনো কি সেখানে ক্লান্ত শরীরকে এলাইয়া দিবার সৌভাগ্য তাহার ঘটিবে ?

গ্রামের বাহিরে ফাঁকা মাঠে তবুও মশা অনেক কম। এইখানেই একটু ভাল জায়গা দেখিয়া বুধী শুইয়া পড়িল। খানিক রাত্রে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মাঠের মধ্যে ফেউ ডাকিতেছে। বাঘ বাহির হইলেই ফেউ ডাকে, বুধীর জানা আছে। ভয়ে তাহার শরীর অবশ হইয়া গেল—সর্ব্বনাশ! যদি বাঘ আসিয়া পড়ে? যদি তাহাকে দেখিতে পায়? সারারাত দূরে দূরে ফেউ ডাকিল। বুধীর ঘুম হইল না। একবার ভাবিল গাঁয়ের মধ্যে কোন গোহালে গিয়া আশ্রয় লওয়া যাক্। পরক্ষণেই ভাবিল, পরের টিট্‌কারী সে সহ্য করিতে পারিবে না—বিশেষতঃ স্বজাতীয়দের ঠাট্টা বিদ্রুপ অসহ্য—তার চেয়ে বাঘের পেটে যাওয়াও ভালো।

শেষ জীবনে এত দুর্দ্দশাও তাহার কপালে ছিল! কেহ ভালবাসে না, কেহ এক আঁটি বিচালি দিয়া আদর করে না, আপনার জন বলিতে কেহ নাই—যাহারা ছিল, তাহারা যে কোথায়, কতদূরে, কোনদিকে—কে তাহাকে পথ নির্দ্দেশ করিবে?

পথে পথে যে কতদিন কাটিল বুধীর তাহা হিসাব নাই। কত মাঠ, কত গ্রাম, কত বিল বাঁওড়ের ধারের বাবলা বন, কত কচুরীপানায় ভর্ত্তি মজাগাঙ। কচুরীপানার পাতা খাইলে মুখ চুলকায় সবাই জানে, বুধী কখনো এর আগে খায় নাই—কিন্তু সব জায়গার ঘাস ভাল নয়—বিশেষত বন্যায় ডোবা পচা ঘাস খাইলে গলা ফুলিয়া মারা পড়িতে হয়, একথা বুধী জানে। বাধ্য হইয়া সুতরাং কচুরীপানার পাতাই এবার খাইতে হইল। এক জায়গায় পথের ধারে একটা কামারের দোকান। চাষালোক লাঙ্গলের ফাল জোড়াইতে আসিয়াছে। বুধীকে দেখিয়া একজন লোক বলিল—গরুডো কাদের হ্যা?

আর একজন বলিল—ফয়জদ্দি বিশ্বেসের গোরুডোর মত দেখ্তি—না মামু? পূর্ব্বের লোকটি বলিল—সে তো ধুঁজি শিংয়ে গাই—এডার মত নয়। বুধীকে একজন আসিয়া ধরিয়া ফেলিল। বুধী তখন অত্যন্ত ক্লান্ত, সাধ্য নাই যে পালায়।

সবাই মিলিয়া দেখিয়া বলিল—এডা ভিন্ গাঁয়ের গোরু, ছাড়ান দাও, কি কত্তি কি হবে, দরকার কি পরের গোরু বেঁধে, শেষকালে কি একটা থানা পুলিশির হ্যাংগমায় পড়তি যাবা? ছাড়ান দাও। দলের মধ্যে একটা লোক ছিল, সে মানুষের মত মানুষ, তার হৃদয় আছে। সে বলিল, আহা, কাদের গোরুডো? হাড়সার হয়ে গিয়েচে। এডা বোধ করি মামু, চালানের পাল থেকে পালিয়ে আসচে। বাড়ী নিয়ে দু'টো সানি খেতে দিইগে—তারপর ছাড়ান দিবানি।

কিন্তু অন্য লোক তাহাকে বাধা দিল। বাড়ী লইয়া যাইতে দিল না। বুধী সেখান হইতে গ্রামের বাহিরের রাস্তা ধরিল। তারপর একদিন আসিল ভীষণ বিপদ। বুধীর ভীষণ তৃষ্ণা পাইয়াছে—কোথাও জল পায় না। অবশেষে একটা কি নদী পাওয়া গেল। তৃষ্ণায় তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে—সে জলের ধারে জল খাইতে গিয়া নরম পাঁকে পুঁতিয়া গেল। এ পাখানা উঠাইতে যায় তো ওখানা ডুবিয়া যায়। ক্লান্ত বুধী সে গভীর হাবড় হইতে নিজেকে কিছুতেই উদ্ধার করিতে পারিল না। জলও খাওয়া গেল না—তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে অথচ দু'হাত দূরে টলটলে কালো জল। সে ক্রমশঃ পাঁকে পুঁতিয়া যাইতে লাগিল—শেষের দিকে বুধীর আর জ্ঞান রহিল না—শকুনিতে তাহার চক্ষু দু'টি ঠুক্‌রাইয়া বাহির করিয়া ফেলিবে, মুচিরা ছাল ছাড়াইয়া লইয়া যাইবে, হাড়গোড় সাদা হইয়া পড়িয়া থাকিবে জলের ধারে, হাড়-বোঝাই নৌকা একদিন কুড়াইয়া নৌকায় বোঝাই দিবে—মাংস খাইবে শিয়াল-শকুনিতে—এ নিষ্ঠুর, অনতিদূর

ভবিষ্যতের ছবি বুধীর চোখের সামনে কতবার সে কালরাত্রির অন্ধকারে ভাসিয়া উঠিল—কতবার মিলাইয়া গেল যে!

সকাল হইল, বেলা হইল। বুধীর তৃষ্ণার্ত্ত আধ-অচেতন চক্ষুদু'টি তখন নদীর কালো জলের দিকে চাহিয়া আছে একদৃষ্টে। একটু জল কেউ যদি দিত!···

খররৌদ্র চড়িল। উলুর ফুল ফুটিয়া আছে হাবড়ের ওপরকার চরে। দু' একটা গাঙশালিক বুধীর নিকটে আসিয়া বুধীর দিকে কৌতূহলের সঙ্গে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল—কিছু বুঝিতে না পারিয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ বোধ হয় বুধীর ভাল জ্ঞান ছিল না। যখন তার চৈতন্য আবার ফিরিয়া আসিল, তখন সে দেখিল, একখানা ছইওয়ালা নৌকা তাহার সামনে দিয়া চলিয়া যাইতেছে—এতক্ষণ পরে এই মানুষের চিহ্ন! বুধী অতিকষ্টে আর্ত্তস্বরে এক আবেদন পাঠাইল—ওগো আমাকে বাঁচাও—কে তোমরা—

নৌকায় ছইয়ের বাহিরে একটি তরুণী বৌ বসিয়াছিল—হঠাৎ তাহার চোখ পড়িল বুধীর দিকে। বৌটি ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—ওগো, বাইরে এসো—একবার এদিকে এসো—

একটি লোক বাহিরে আসিয়া বলিল—কি—! কি হয়েচে?

—ওগো, ছ্যাখো একটা গরু হাবড়ে পড়েছে। আহা, কতক্ষণ হয়তো পড়ে আছে, উঠতে পাচ্চে না—ওকে উঠিয়ে দিতে হবে।

লোকটি তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল—ওঃ এই! আমি বলি কি না কি। ও কিছু না, যাদের গরু তারা এসে উঠিয়ে নিয়ে যাবে এখন।

বুধী বৌটির চোখে মুখে দয়া ও মনুষ্যত্ব দেখিতে পাইয়াছিল আগেই—সে মানুষ চেনে। বুধী আকুলনেত্রে আর্ত্ত আবেদনের দৃষ্টিতে বৌটির দিকে চাহিল। বৌটি বলিল—ওই দেখো না কেমন করে

চাইচে – না, ওকে না তুলে দিয়ে যাওয়া হ'বে না – এই চরে এখানে মানুষজন কোথায় যে ওকে তুলবে ?

নৌকার মাঝিরাও বলিল। এর নাম চাঁপাবেড়ের চর। এ তল্লাটে মনিষ্যি নেই বাপু! মা ঠাকরুণ ঠিকই বলচেন।

লোকটি বিরক্তি প্রকাশ করিল। নানা ওজর আপত্তি তুলিল কিন্তু বৌটি নাছোড়বান্দা। গরুটাকে না তুলিয়া যাওয়া হইতেই পারে না। বলিল – দ্যাখো, যাওয়া হচ্ছে একটা মঙ্গলের কাজে – গোড়াতেই একটা অমঙ্গল দিয়ে সুরু করা চলে? এই বুড়ো গরুটার চোখের চাউনী আমি সারাদিন ভুলতে পারবো না – ও মরে যাবে এই হাবড়ে যদি কেউ না তোলে।

লোকটি বিরক্তিপুর্ণ সুরে বলিল – তোমায় নিয়ে বেরুলেই একটা না একটা হাঙ্গামা পোয়াতেই হবে এই ধরণের – এখন কোথায় লোকজন পাই যে গরু তুলি। বাঁশ চাই, দড়ি চাই, লোক চাই – ও কি সোজা পু্তে গিয়েচে দেখচো না ?

ঘণ্টাখানেক নৌকা সেখানে বাঁধা রহিল। নৌকার মাঝিরা নামিয়া কোথা হইতে জনকতক লোক ডাকিয়া আনিল – আরও ঘণ্টাখানেক টানাটানির পরে সকলে মিলিয়া বুধীকে টানিয়া তুলিল হাবড় হ'তে!… জল! জল – সে একটু জল খাইবে!

বৌটি বলিল – আহা কি তেষ্টাটাই পেয়েছিল দেখলে? চোঁ চোঁ করে এক গাঙ্ জল খেয়ে ফেললে – বুড়ো গরু! দেখ না ওর পা কাঁপচে, দাঁড়াতে পারচে না।

লোকটি পা খিচাইয়া বলিল—মরুক গে। ট্রেনটা ফেল হোল তো এখন? কোথাকার এক ছেঁড়া ল্যাঠা জুটিয়ে দু'টি ঘণ্টা দিলে কাটিয়ে। চলো এখন—স্টেশনে বসে থাকো রাত দশটা পর্য্যন্ত।

নৌকা চলিয়া গেল। বুধী কি বলিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইবে?

…ওগো অপরিচিতা, জীবনের বড্ড শেষের দিকে তুমি এলে। তোমার মত মানুষের সঙ্গে যদি আগে দেখা হোত।…যাও যেখানে যাবে।

গরুর আশীর্ব্বাদে মানুষের কোন কাজ হয় কি না, জানি না—শুভ হোক তোমার জীবনের যাত্রাপথ।

তারপর আরও কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে। একদিন বুধীর সারাদিন ভয়ানক কষ্ট গেল। সে দিন যেমন দারুণ বর্ষা, তেমনি ঝড়। তেমনি একটা বড় গাছও পাওয়া গেল না যাহার নীচে এই ভীষণ ঝড়-বৃষ্টিতে সে আশ্রয় নেয়। একটা বাঁশ-ঝাড়ের তলায় আরও কয়েকটি গরুর সঙ্গে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটাইয়া সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িল।

সকাল হইতেই বুধীর ঘুম ভাঙ্গিল। সারা গায়ে জোঁক লাগিয়া তাহার অর্দ্ধেক রক্ত চুষিয়া খাইয়াছে; এমন ভয়ানক জায়গা। ঝড়-বৃষ্টি থামিয়াছে; রৌদ্র উঠিল।

হঠাৎ কিছু দূরে একটা পুকুর ও তার পাশের আমবাগান দেখিয়া তাহার মনে কেমন সন্দেহ হইল।

জায়গাটা যেন পরিচিত মনে হইতেছে।

বুধী আগাইয়া গিয়া দেখিল। এই আমবাগান তো সে ইহার আগেও দেখিয়াছে; যে দলটির সঙ্গে সে সেবার গিয়াছিল—এই আমবাগানে তাহারা একদিন রাত্রি কাটায়; পাশে পথটা—ওটাও সে চেনে।

বুধী সেই পথ বাহিয়া আগ্রহের সহিত হাঁটিয়া চলিল—যতই যায় ততই তাহার বেশ মনে পড়িতে লাগিল, এই পথ তাহার পরিচিত। এ পথে সে আগে আসিয়াছে। এমন কি একদিন মনে হইল, তাহাদের গ্রাম আর বেশী দূরে নাই। ওই পথে সে পাউণ্ডঘর হইতে ফিরিয়াছে দু'তিন বার। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বুধীর মনে হইল তার হৃদস্পন্দন

বুঝি বন্ধ হইয়া যাইবে ! ওই তো তাহাদের গ্রাম, তাহাদের গ্রামের সেই বড় অশ্বথ গাছটা ; ওই তো সেই বেগুনের ক্ষেত – ক্ষেতের পাশেই তাহাদের নদী ; ওই তো গ্রামের ভাগাড়, ভাগাড়ের পাশে ভাঙা ইঁটখোলা।

বুধী দৌড় দিল ; তখন আনন্দে সে প্রায় জ্ঞানশূন্য।

সন্ধ্যা হইবার দেরী নাই। বুধী দূর হইতে বাড়ী দেখিতে পাইল। গাবতলায় যে আনারসের জমি ছিল, বুধী আনন্দে উৎসাহে আনারসের ক্ষেতের বেড়া ভাঙিয়া ছুটিতে ছুটিতে বাড়ীর উঠানে গিয়া পৌছিতেই কোথা হইতে এক তীক্ষ্ণ মিষ্টি ক্ষুদ্র মেয়েলি কণ্ঠের আনন্দ ও বিস্ময় ভরা চীৎকার শোনা গেল – "ওমা, ও ঠাকুরমা, শীগগির এসে ত্থাখো কে এসেচে - শীগগির এসো –

পরক্ষণে বুধী তার গলায় ছ'টি নরম কচি হাতের সাগ্রহ নিবিড় বেষ্টন অনুভব করিল। খুকীর মা বাহিরে আসিয়া বলিলেন, কে এসেছে বলছিস্ খুকী ?···ওমা, ও কে, বুধী না ?

খুকীর ঠাকুরমা আসিয়া বলিল—বুধী এলো কোত্থেকে ! আহা, কি হাড়সার হয়ে গিয়েছে, ওকে যে আর চেনা যায় না !

খুকীর মা বলিলেন—ও কি করে পালিয়ে এলো আজ ছ'মাস পরে ! ঠিক ছ'মাস হ'য়েচে। আমি তখন বলেছিলুম চালানে পালে গরু বেচে না ওরা—শুনিচি নাকি কলকাতায় কসাইখানায় নিয়ে গিয়ে বিক্রী করে। সত্যি মিথ্যে জানিনে বাপু। এই রকম কিন্তু সবাই বলে। তোমরা তখন শুনলে না—ভাবলে বুড়ো গরু দুধ তো আর দেবে না— বেচে ফেলে আপদ মিটিয়ে দিই। সংসারের মঙ্গল হোত ভাবচো ওই গরু যদি বেঘোরে মারা যেতো ? ও কি করে পালিয়ে এলো তাই ভাবি ! বোধ হয় রাস্তা থেকে পালিয়েছে পাল থেকে, কি হাড়সার হয়ে গিয়েচে, মা গো মা !

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বুধী গোহালে শুইয়া পড়িয়াছে। এই তাহার আপনার গৃহ – এখনও তাহার বিশ্বাস হইতেছে না যে, সত্যই বাড়ী ফিরিয়াছে। এই তাহার আবাল্য পরিচিত গোহাল, এই সে বিচালির গাদা, সেই রকম ঘন সাজালের ধোঁয়ায় গোহাল অন্ধকার – একটাও মশা নাই, বড় বাছুরটা একপাশে সানি খাইতেছে। খুকীদের রান্নাঘরে খুকীর মা রাঁধিতেছে, খুকীর উচ্চকণ্ঠ শোনা যাইতেছে। কাল সকালে নদীর ধারে তার প্রিয়, পরিচিত মাঠটিতে সে ঘাস খাইতে যাইবে। আর একটা সাথী বন্ধু জুটিয়া যাওয়াও বিচিত্র নয়।

বিধু মাস্টার

বিধু মাষ্টারের কথা আমি কখনও ভুলতে পারব না। তাঁর স্মৃতি হয় তো আজীবন আমায় বহন করে বেড়াতে হবে। মাত্র ক'টা মাস তিনি আমার কাছে এসেছিলেন, তারপর চলে গেলেন—শুধু এই ক্ষণিকের পরিচয় আজ অমর হয়ে র'য়েছে।

বেশ মনে আছে, সে দিনটা ছিল রবিবার। আমি সকালবেলা কৌমুদী খুলে ধাতুরূপ করছি চোখ বন্ধ করে দুলে দুলে, এমন সময়ে বাইরে কে যেন ডাকলেন, হারাণবাবু আছেন? হারাণবাবু!

আমি জানালা দিয়ে মুখ বার ক'রে প্রশ্ন করলুম, কাকে চাই?

এখানে হারাণবাবু বলে কি কেউ থাকেন?

থাকেন। তিনি আমার কাকা।

তাঁকে একবার ডেকে দাও তো।

কি দরকার?

তাঁর কি একজন টিউটর চাই?

সত্যিই তো মেজ-কাকা আমাদের জন্য একজন টিউটর চাই ব'লে খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। কথাটা আমি একেবারে ভুলেই গেছলুম। বললুম, আপনি বুঝি সেই বিজ্ঞাপন দেখেই আসছেন।

হাঁ।

তা ভেতরে এসে বসুন। আমি মেজ-কাকাকে ডেকে দিচ্ছি।

ছিপ্‌ছিপে, লম্বা, কালপানা লোকটা অত্যন্ত দ্বিধায়, অতি সন্তর্পণে আমাদের বৈঠকখানায় প্রবেশ করলেন। আমি বললুম, বসুন আপনি।

তিনি ভয়ে ভয়ে যেন একবার আমার দিকে তাকিয়ে একখানা পাশের বেঞ্চে বসলেন। আনাড়ী লোকটাকে দেখে আমার মাস্টারের প্রতি সকল শ্রদ্ধা তিরোহিত হল। বললুম, ঐ চেয়ারটায় বসুন না।

তিনি প্রথমে বল্‌লেন, থাক্ থাক্। তারপর একখানা চেয়ারে গিয়ে বসলেন। আমি ফ্যানটা খুলে দিয়ে আস্তে আস্তে ওপরে চলে গেলুম মেজ-কাকাকে ডেকে দিতে। মেজ-কাকা উঠে এলেন, আমিও এলুম তাঁর পিছু পিছু, আর এল ঝণ্টু, মিণ্টু, চাঁদু ও রেবা। মেজ-কাকা বৈঠকখানায় ঢুকতেই তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে হাত-জোড় ক'রে তাঁকে নমস্কার করলেন। মেজকাকা বললেন, আপনি তো আজ সকালে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আসছেন ?

তিনি বল্‌লেন, হাঁ।

মেজ-কাকা আবার বলতে আরম্ভ করলেন, এই পাঁচটি ছেলে-মেয়েকে পড়াতে হবে। রাতে তিন ঘণ্টা। মাইনে তো লিখেই দিয়েছি সাত টাকা। কামাই চলবে না।

তিনি বললেন, না, কামাই করবোই বা কেন ?

মেজ-কাকা বললেন, তা আপনি থাকেন কোথায় ?

শ্রীনাথদাস লেনে।

আপনার নাম ?

শ্রীবিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

কদ্দুর লেখাপড়া আছে ?

ম্যাট্রিক পাশ।

কথাটা শুনে মেজকাকা ঠোঁট কামড়াতে লাগলেন, টেবিলের ওপর

বার কয়েক ডান হাত দিয়ে আঘাত করলেন। তারপর বললেন, আপনি ফোর্থ ক্লাসের ছেলেকে পড়াতে পারবেন তো?

ফোর্থ ক্লাসে পড়ি কেবল আমি। এদের দলের মধ্যে বয়সে সব চেয়ে বড়। আমার বুক গর্ব্বে ফুলে উঠল। আমি বিধু মাস্টারের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম। তিনি বললেন, তা' আর পারব না কেন?

মেজ-কাকা বললেন, বেশ ভাল। সোমবার থেকে কাজে লাগবেন। সন্ধ্যে ছ'টার সময়ে ঠিক মত আসবেন। তারপর আমাদের বললেন, ইনি তোদের নতুন মাস্টার, এনার কাছে মন দিয়ে পড়বি। বুঝলি?

তারপর সোমবার দিন তিনি এলেন ঠিক ছ'টার সময়ে। আমাদের সকলের নাম জিজ্ঞেস করলেন—আমাদের বইগুলো উল্‌টে পাল্‌টে দেখলেন—বেশীক্ষণ দেখলেন আমার ইংরিজি বইখানা। বল্‌লেন, বেশ শক্ত বই পড়ানো হয় তো।

তাঁর কথা শুনে আমার কি আনন্দই না হল! আমি বললুম, আমাদের আবার ইংরিজি ফিজিকস্, কেমিষ্ট্রি পড়ান হয়।

তিনি অবাক হয়ে গেলেন, বললেন, তাই নাকি?

আমি তাঁকে আমাদের সায়েন্স বইখানা এনে দেখালুম। তিনি বললেন, কি পড়া হ'য়েছে?

প্রপারটিস্ অব্ এয়ার আর ব্যারোমিটার।

আমার কথাগুলো শুনে তিনি বেশ চম্‌কে গেলেন আর আমি খুব কৌতুক বোধ করলুম।

তিনি তখন রেবাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি খুকি?

রেবা লজ্জায় মুখ নীচু করে রইল। নতুন লোক দেখলে ওর ঐ রকম লজ্জা। আমি বললুম, বল্ না রে কি নাম?

তিনি তখন রেবার পশমের মত কোমল চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। রেবাও অনেক কষ্টে বলল, লেবা।

ও 'র' উচ্চারণ করতে পারে না। তিনি বললেন, বা! বেশ নাম তো তোমার, খাসা নাম তো তোমার।

কিন্তু দিন যত বয়ে গেল রেবার লজ্জাও তত কমে যেতে লাগল আর বিধু মাস্টারও রেবাকে বেশী ভালবাসতে লাগলেন। শুধু রেবাকেই না, তিনি আমাদের সবাইকেই খুব ভালবাসতেন। তিনি পড়াতে আসবার পর প্রায়ই একজন ফেরিওয়ালা সুর করে করে হেঁকে যেত, চাই অবাক জলপান, স্বাধীন, ভাজা ঘুঘনি দানা।

মাস্টার মশাইও আমাদের প্রায় ঐ কিনে খাওয়াতেন। নতুন মাইনে পেয়ে তিনি আমাদের সবাইকে বার আনা কুল্পী বরফ খাইয়েছিলেন। সবাই তাই মাস্টারকে খুব ভালবাসতো। তাঁকে আদৌ দেখতে পারতুম না কেবল আমি। কেন তা জানি না। তথাপি আমার অনিচ্ছায় তাঁর অধীনে থাকতে হোত কারণ মেজ-কাকার হুকুম। মেজ-কাকাকে আবার সবার চেয়ে ভয় করি, মায় বাবার চেয়েও। সুতরাং আমি খুঁজতে লাগলুম মাস্টারের ভুল ত্রুটি, যাতে আমি তাঁর হাত থেকে রেহাই পাই। একদিন আমি জিজ্ঞেস করলুম, মাস্টার মশাই, পাহাড়ের হাইট মাপতে গেলে ব্যারোমিটার কি দরকার লাগে?

তিনি বললেন, দরকার লাগে নাকি? কে বলল?

স্কুলের মাস্টার।

তা হ'বে। কোথায় লেখা আছে বল তো?

সায়েন্সের বইতে।

দেখি সায়েন্সের বই।

আমি তাঁর হাতে বইখানা তুলে দিয়ে বললুম, কিছুই বুঝতে পারিনি মাস্টার মশাই।

তিনি বইয়ের পাতা খুলতে খুলতে বললেন, বেশ বুঝিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু আমায় বোঝান দূরের কথা তিনি নিজেই হয়তো সেই ইংরিজি অংশটার সঠিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন না। অগত্যা অনেকক্ষণ পরে তর্জ্জমা করে দিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, বুঝতে পেরেছো ?

আমি বললুম, কিছুই না।

তিনি বললেন, আচ্ছা, আমি তোমার বইখানা বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি, একবার পড়ে ভাল করে বুঝিয়ে দেবো।

বইখানা নিয়ে গেলেন সত্যি, সেটা আমায় ফিরিয়েও দিলেন যথা সময়ে ; কিন্তু আমার প্রশ্নের কোন উত্তর দিতেই পারলেন না। কথাটা কাকাকে বলতে তিনি বললেন, আচ্ছা, কেমন পড়ায় তা আমি দেখ্‌ছি।

পরের দিন থেকে তিনি আমাদের কাছে বসে পড়া শুনতে লাগলেন। মাস্টার মশাইয়ের পড়ানর তিনি প্রায়ই ভুল ধরতেন। হয়তো বলতেন, লুসি গ্রের শেষের ষ্ট্যাঞ্জা দুটো আরও বিশদভাবে বুঝিয়ে দিন। ঐ যে ওর

O'er rough and smooth she trips along
And never looks behind ;
And sings a solitary song
That whistles in the wind.

ওর ভাবার্থটাও ভাল করে দেওয়া উচিত। বুঝেছেন কি না ?

এ সব ক্ষেত্রে মাস্টার মশাই কোন কথা বলতেন না বড় একটা। কাকাকে তিনি বেশ সমীহ করে চলতেন।

তিনি বড় একটা বুদ্ধির অঙ্ক কষতে পারতেন না। একদিন কাকার সামনে তিনি একটা অঙ্ক এক্স দিয়ে কষ্‌ছিলেন। কাকা বললেন, সব গোলমাল হয়ে গেল মাস্টার মশাই।

তিনি বললেন, কেন ?

কাকা বললেন, ও অঙ্ক তো আলজেব্রার প্রসেস্ অনুযায়ী আপনি করতে পারবেন না।

যাই হোক, তিনি কিন্তু কোন উপায়েও আমায় অঙ্কটা বুঝিয়ে দিতে পারলেন না। তিনি চলে যাবার পর কাকা বললেন, মাস্টার, তত সুবিধের নয়।

এমন সময়ে বিশ্বকর্ম্মা পুজা এল। আমরা বললুম, মাস্টার মশাই, আমাদের ঘুড়ী লাটাই কিনে দিতে হবে।

তিনিও রাজী হলেন কারণ তিনি সম্প্রতি মাইনে পেয়েছিলেন। তিনি আমাদের সেণ্ট জেমস্ স্কোয়ারের দক্ষিণ কোণের একটা মনোহারী দোকান থেকে এক টাকার প্রায় ঘুড়ী লাটাই কিনে দিলেন। কিন্তু আমাদের তিনি যা কিনে দিতেন সে সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলা নিষেধ ছিল। এসব লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের দিতেন। রেবার জন্ম-দিনে তিনি তিন টাকা দামের একটা কলের রেলগাড়ী কিনে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, কাউকে বোলো না যেন ঘুণাক্ষরে।

বিশ্বকর্ম্মা পুজার দিন চারেক পর একদিন শ্রীনাথ দাস লেনে মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে দেখা। আমি নমস্কার করলুম। তিনি বল্লেন, এই যে পিণ্টু যে। কোথায় চলেছো ?

আমি বললুম, আপনি কোথায় থাকেন মাস্টার মশাই ?

তিনি বললেন, এইখানেই।

চলুন না দেখে আসি।

কি জানি কেন মাস্টার মশাইয়ের বাড়ী দেখবার জন্যে আমি অত্যন্ত উতলা হলুম। তিনি দ্বিধায় আমায় নিয়ে গেলেন তাঁর অপূর্ব্ব গৃহে। টিনের চাল দেওয়া একখানা মেটে বাড়ীর দোতালার একখানা ছোট্ট ঘরে থাকেন। সরু ভাঙ্গা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে ভয় করে। ফালি বারান্দাটা মানুষের ভারে সামান্য কাঁপে। আস্তে আস্তে

তাঁর পিছু পিছু তাঁর ঘরের দিকে গেলুম। তিনি গিয়ে তাঁর ঘরের তালা খুললেন। অপরিষ্কার ও অপরিসর ঘর। দেওয়ালে কতকগুলো ক্যালেণ্ডার টাঙানো। একপাশে একখানা বিবেকানন্দের ছবি। মেঝের ওপর একটা খাটিয়া পাতা, তার ওপর আবার একটা কালো ও তেল চিটচিটে বালিস। মাস্টার মশাই আমায় বসিয়ে 'আসছি' ব'লে কোথায় চলে গেলেন সহসা। আর আমি তাঁর ঘরখানা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলুম। বড় দুঃখ হ'ল তার দারিদ্র্যক্লিষ্ট অবস্থা দেখে। ঘরের মধ্যে আর একখানা কাপড়ও নেই। যদিও বা একখানা আছে তাও শতছিন্ন এবং অত্যন্ত কালো। একটি জামা ও একখানি মাত্র কাপড়ে তাঁকে দিন কাটাতে হয়। আমার বড় অনুকম্পা জাগল তাঁর প্রতি। তাঁকে যে আমি এত ঘৃণা করতুম তা একেবারে বিস্মৃত হলুম। হঠাৎ যেন আমি একেবারে বদলে গেলুম।

এমন সময়ে মাস্টার মশাই এক ঠোঙ্গা খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। আমি ব্যথিত স্বরে বললুম, ও সব আবার কেন মাস্টার মশাই ?

তিনি আমার কথা শুনে একটু যেন আশ্চর্য্যান্বিত হলেন। আমতা আমতা করতে লাগলেন, না-না, এ আর এমন কি ?

আমি বুঝলুম যে তাঁর শ্রমের পারিশ্রমিকটা এমন করে অপচয় করা তাঁর শরীরের বিন্দু বিন্দু রক্ত গ্রহণ করার সামিল। আমি তীব্র প্রতিবাদ করলুম, না, এ কখনই হবে না।

আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখে তাঁর মুখের চির প্রফুল্ল হাসি অকস্মাৎ যেন মিলিয়ে গেল। তিনি মুখ চুণ করে বললেন, এ কি বলছো পিণ্টু ?

আর সাহস হল না কিছু বলতে। যাই হোক, বাড়ী ফেরবার পথে সেদিনই আমি প্রতিজ্ঞা করলুম যে মাস্টার মশাই যাতে আমাদের জন্যে তাঁর মাইনে থেকে কিছু খরচ না করেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। হাজার হোক বেচারা ঐ ক'টি টাকা সম্বল ক'রে কলকাতায় বাস করছেন।

কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা মত কাজ করবার আগেই একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেল। মেজ-কাকা একদিন আমার ট্রানশ্লেশনের খাতাখানা দেখ্‌তে দেখ্‌তে মাস্টার মশাইকে বললেন, এ সব কি পড়াচ্ছেন মাস্টার মশাই! ইংরিজি আপনি দেখছি কিছুই জানেন না। **I live in a boarding** সেন্‌টেন্‌সটার মধ্যে **'in'** কি এমন অপরাধ করেছে যে ওকে তুলে আপনি **'at'** বসিয়ে দিলেন। আসলে ওর ভুল কোথায় তা' তো দেখতে পেলেন না। আর **Every bush and every tree was in bud** সেন্‌টেন্‌সটার **'was'** কেটে **'were'** করলেন কোন্ **Grammar** অনুযায়ী? আপনি ফোর্থ ক্লাশের ছেলে পড়াবেন কেমন করে?

মাস্টার লজ্জায় মুখ নীচু করে রইলেন। আর আমি? আমি ভাবতে লাগলুম ভাবী বিপদের কথা। মেজ-কাকা বললেন, তাই বলি ছেলেরা এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেন। পিন্টু তোর হাফ্-ইয়ারলির প্রোগ্রেশ্ রিপোর্টটা নিয়ে আয় তো।

আমি ভয়ে ভয়ে আমায় প্রোগ্রেশ্ রিপোর্ট নিয়ে এলুম। মেজ-কাকা বললেন, দেখুন কি বিশ্রী রেজাণ্ট! ইংরেজিতে তো ফেল। আর সবে রগ ঘেঁষিয়ে পাশ করেছে। এর পর আর আপনাকে রাখতে আমি সাহস করি না। তা হ'লে ওদের পায়ে কুড়ুল মারা হয়। আমরা অন্য মাস্টার দেখবো। আপনার বাকী মাইনেটা দু' তারিখে নিয়ে যাবেন।

মেজ-কাকার কথার মাস্টার মশাই একটি প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করলেন না. নীরবে নিঃশব্দ পদক্ষেপে প্রস্থান করলেন। আমি তাঁর মুখের দিকে তাকাতে পারলুম না। এর জন্যে দোষী তো আমি। আমি তো মাস্টার মশায়ের ভুলগুলো মেজ-কাকাকে বলে বলে তাঁর মন একেবারে চটিয়ে রেখেছিলুম।

আমি অপরাধীর মত বসে রইলুম মুখ নীচু করে।

উন্নতি

গোকুলদের অবস্থা—সে কত শোচনীয়,—তা গ্রামের বুদ্ধিমতী গোকুলের মা নিজেদের দারিদ্র্য লোক-চক্ষু থেকে যথাসাধ্য লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করতো। কিন্তু এবার শীতকালের দিকে অবস্থা এমনি দাঁড়ালো—যে আর কোন রকমে ঢেকে রাখা চলে না। গোকুলের মা একদিন সন্ধ্যাবেলা ছেলেকে বল্লে, সত্যি গোকুল, তুই বসে বসে আর কতদিন সংসারটা মাটি করবি? একটা কিছু ছাখ একবার।

গোকুল পৈতৃক কোঠাবাড়ীর ভাঙ্গা রোয়াকের একপাশে বসে সান্ধ্য চা পানে নিযুক্ত। অর্থাৎ চটা-ওঠা একটা কলাই-করা বাটীতে সে একপ্রকার ফিকে কটা রংয়ের বিস্বাদ তরল পদার্থ সেবন করছিল—তাতে দুধের ছিটে ফোটা থাকলেও চিনির বালাই ছিল না। পুরোণো খেজুর গুড় সংযোগেই গোকুলের প্রাত্যহিক চা পান নিষ্পন্ন হয়—আজ ওর মা গুড় দিতে নারাজ,—ও চাইতে গিয়ে বিমুখ হয়ে এসেচে। মায়ের কথার মধ্যে যুক্তির অভাব ছিল না। বাড়ীতে ঠাকুর পুজো আছে, দশমী দ্বাদশী আছে, এক ভাঁড় খেজুর গুড় এসে সিকি ভাঁড়ে ঠেকেচে—নূতন বছরে এখনও গুড় কেনা হয়নি বা কেনবার পয়সাও নেই—ওইটুকু ফুরিয়ে গেলে তখন চলবে কিসে?

এই গুড়ের ব্যাপার নিয়ে মায়ে ছেলেয় বচসা চললো সারা সন্ধ্যা বেলা।

গোকুল বিয়ে থাওয়া করেনি, বয়েস এই মোটে পঁচিশ বছর, বাপ মারা যাওয়ার পরে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে আজ আট দশ বছর বাড়ী বসে আছে—গরীব বামুনের সহায় সম্পত্তিহীন ছেলে, কে চাকুরী করে দেবে? ···লেখাপড়ারও তেমন কিছু জোর নেই। সংসার অবিশ্যি খুব বড় নয়, সে আর তার মা। গোকুলের বাবা বেঁচে থাকৃতেই মেয়েটির বিবাহ দিয়ে গিয়েছিলেন বারো বছর বয়সে, তাই রক্ষে—নইলে এ বাজারে আর ভগ্নীর বিবাহ দেওয়া গোকুলের সাধ্যে কুলিয়ে উঠতো না।

গোকুলের মা বল্লে, আমার বুদ্ধি শোন গোকুল, চল আমরা কলকাতায় যাই। সেখানে কত লোক কত কি করচে, সেখানে গেলে তোর একটা হিল্লে হ'য়ে যাবেই—আমিও তোকে ফেলে থাকতে তো পারবো না। আমিও সঙ্গে যাই। বড় আম বাগানটা বিক্রী করে ফেলি।

এ প্রস্তাব মা আরও কয়েকবার করেচে, কিন্তু গোকুলের গাঁ ছেড়ে কোথাও যেতে মন সরে না। কলকাতা সহরকে সে মনে মনে ভয় করে। অত বড় সহরে তো তার জন্যে চাকুরী নিয়ে লোকে বসে আছে। মার যেমন কথা।

আজ কিন্তু মার কথায় তার মনটা উৎসাহিত হয়ে উঠলো। ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখলে হয় একবার। এখানেও তো মাঝে মাঝে অনাহার সুরু হ'য়েচে আজকাল, সেখানে তার চেয়ে আর কি বেশী কষ্ট হবে? কলকাতায় পয়সা রোজগারের অনেক রকম উপায় আছে সেও শুনেচি বটে।

সারারাত ধরে মা ও ছেলে পরামর্শ করলে। বড় বাগান বিক্রী করলে এখন দর হবে না, বন্ধক রেখে সেই টাকা থেকে প্রথম মাস কয়েক সহরের খরচ চলবে। এখানকার বাড়ীতে কিছুদিন তালা বন্ধ থাকুক।

অবশেষে কলকাতায় যাওয়াই ধার্য্য হোল। যদুহরি কুণ্ডু স্থানীয় বাজারের বড় কাপড়ের মহাজন—বাগানখানা পঞ্চাশটি মাত্র টাকায় তার

কাছে বন্ধক রাখা হ'ল এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে মায়ে ছেলেয় কলকাতায় রওনা হোল। চিৎপুর শোভাবাজারে শঙ্কর মিত্রের লেনে ওদের গ্রামের এক নাপিত থাকতো। বাক্স হাতে ঝুলিয়ে জাত-ব্যবসা করে সে ত্রিশ চল্লিশ টাকা রোজগার করতো মাসে। গোকুল খুঁজে খুঁজে তার বাসা বার করলে। একখানা ছোট্ট খোলার ঘর—তাতে সে একা থাকে, নিকটবর্ত্তী হোটেলে একবেলা ডাল-ভাত খায়, একবেলা মুড়ি খেয়ে কাটায়, এই তার অবস্থা। গ্রামের ব্রাহ্মণ কন্যা, তার খোলার ঘরে অতিথি, বঙ্কু পরামাণিক শশব্যস্ত হ'য়ে উঠলো। রান্নার হাঁড়ি কুড়ি কিনে নিয়ে এল, আর নিয়ে এল চাল, ডাল, তরকারী। খোলার ঘরে একখানা ছোট্ট পরচালার নীচে আপাততঃ রান্নার ব্যবস্থা করা হোল।

বঙ্কু বল্লে—মা ঠাকরুণ, রোজ রোজ মরি উড়ে বামুনের রান্না খেয়ে, আজ আমার সৌভাগ্যি যে আপনারা এয়েচেন, মা ঠাকরুণের হাতের দু'টি প্রসাদ খেয়ে বাঁচবো আজ।

গোকুল আর তার মা বঙ্কু পরামাণিকের সেই খোলার বাসার পাশেই আর একখানা ছোট খোলার ঘর নিলে। মাসে মাত্র তিনটি টাকা ভাড়া।

গোকুলের মা এখানে এসে অকুল সমুদ্রে পড়ে গিয়েছে—একমাত্র ভরসা বঙ্কু পরামাণিক যে কলকাতার রাস্তাঘাট চেনে—সে যদি কিছু কিনারা করতে পারে এর।

প্রতিদিন দুপুরে আর সন্ধ্যাবেলা নিকটেই কোথায় শাঁখ, ঘণ্টা, কাঁসরের আওয়াজ আসে। একদিন গোকুলের মা জিগ্যেস করলে—হ্যাঁ বঙ্কু, এখানে কি কোথাও ঠাকুরবাড়ী আছে নাকি? বঙ্কু বল্লে, হ্যাঁ মা ঠাকরুণ, পাশেই মিত্তিরবাড়ী, ওরা মস্ত বড়লোক। ওদেরই তো ঠাকুরবাড়ী র'য়েছে বাড়ীতেই। এই রাসের সময় খুব ধুমধাম

হবে—আপনি যাবেন না দেখতে? সবাই যাবে। খুব ভাল বন্দোবস্ত।

রাসের দিন পাড়ার আরও পাঁচজন মেয়ের সঙ্গে গোকুলের মা মিত্তির-বাড়ী ঠাকুর দেখতে গেল। প্রকাণ্ড শ্বেতপাথরের বাঁধানো মেঝের উপর ঝক্‌ঝকে রূপোর বাসনে ভোগ, রূপোর ঘণ্টা, কড়িকাঠ থেকে বড় বড় কাঁচের পরকলাওয়ালা ঝাড়ে ইলেট্রিক আলো জ্বলচে, ধুপ ধুনোর গন্ধ বেরিয়ে ঘর আমোদ করেচে, আর নানা রকম ফুলের কি চমৎকার গন্ধ।

গোকুলের মা এমন ঠাকুরবাড়ী, এমন জাকজমক কখনো দেখেনি জীবনে, বাড়ীর কর্ত্রী-ঠাকরুণ ঠাকুরের এক পাশে বসেছিলেন, লোক চিনিয়ে দিলে। আশী বছর হ'য়েচে, এখনও কি ধপ্‌ধপে গায়ের রং।

আরতি ও কীর্ত্তনাদি শেষ হয়ে যাওয়ার পরে প্রসাদ বিতরণ ও ব্রাহ্মণ ভোজন। গোকুলের মা বড় থালার এক থালা খাবার নিয়ে বাড়ী এল। মা ও ছেলে দু'জনেই খুব খুসী, এসব খাবার ফলমূল কখনো পাড়াগাঁয়ে ওরা চোখেও দেখেনি।

গোকুলের মা আরও দু'চারদিন ঠাকুরবাড়ী সন্ধ্যাবেলা কীর্ত্তন শুনতে গেল।

একদিন গিন্নিমা ওকে লক্ষ্য করলেন। নূতন মুখ, একে তো আগে কখনো দেখেন-নি ঠাকুরবাড়ীতে।

কাছে ডেকে বল্লেন—তোমার বাড়ী কোথায় গা? এসো তোমার সঙ্গে আলাপ করি। গোকুলের মা সম্ভ্রমে, সঙ্কোচে একেবারে জড়সড় হয়ে গেল। মুখ দিয়ে ভাল কথা বেরোয় না, এত বড় বাড়ীর কর্ত্রী নিজে যেচে তার সঙ্গে আলাপ করতে চাইচেন। ও সব পরিচয় দিলে। দেশে দুঃখকষ্টে পড়ে এখানে এসেচে, কাছেই খোলার বাড়ীতে থাকে। ছেলেটি চাকরী-বাকরীর চেষ্টা করচে। কেই বা চাকরী দেবে, এখানে ও কাউকেই চেনে না!

গিন্নীমা ওর সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা কইলেন, লোকটি বড় ভালো। বল্লেন—আমাদের ঠাকুরবাড়ীতে রাত্তিরের ভোগ ব্রাহ্মণ-বাড়ী দেওয়ার নিয়ম আছে। তুমি বাছা রোজ এসে আরতির পরে ভোগ নিয়ে যেও, আমার বলা রইল। কত রবাহুত, অনাহুত লোক এসে খেয়ে যায়। তুমি আর তোমার ছেলে খেলে আমি খুসী হবো।

সেদিন থেকে গোকুলের মায়ের কপালে যা ঘটতে লাগলো—সে স্বপ্নেও তেমন সৌভাগ্য কখনো কল্পনা করে নি।

মস্ত বড় এক থালা-ভর্ত্তি লুচি, তরকারি, মিষ্টি, ফলমূল গোকুলের মায়ের বাড়ী নিয়ে যাওয়াই কষ্ট। কে কত খায়? বঙ্কু নাপিত পর্য্যন্ত লুচি খেয়ে আর পারে না। রোজ রাত্রে লুচি। রোজ রাত্রে একরাশ ফলমূল, বাদাম পেস্তা ছানা মিষ্টি। বড লোকের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের নৈশ ভোগের যা কিছু উপকরণ সকল ওদের বাড়ীতে।

মাঘ মাসের দিকে ঠাকুরবাডীর পুরাতন টহলদার মারা গেল। গিন্নীমা গোকুলের মাকে সে কাজে নিযুক্ত করলেন। মাইনে পাবে সাত টাকা, দু'বেলা ভোগের প্রসাদ পাবে। সকলের ভোগটা খুব জমকালো, উপকরণেও বেশী—কিন্তু চারজন ব্রাহ্মণের মধ্যে সে ভোগটা বিলি করে দেওয়ার প্রথা অনেকদিন থেকে প্রচলিত, গোকুলের মায়ের সুপারিশে গোকুল সেই চারজন নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের অন্যতম হয়ে দাঁড়ালো।

এছাড়া পূজাপার্ব্বণে, বড় বড় উৎসব উপলক্ষে কাপড়-চোপড়ও পাওয়া যায়—ভোজন দক্ষিণা থেকে ওঠে! গিন্নীমা গোকুলের মাকে বড় অনুকম্পার চোখে দেখতে আরম্ভ করেচেন, এতে অন্যান্য ঝি-চাকরের চোখ টাটায়।

একদিন গিন্নীমা বল্লেন—হ্যাঁ বাছা, তোমার ছেলে লেখাপড়া জানে

কতদূর? গোকুলের মা ভাল জবাব দিতে পারলে না। লেখাপড়া সম্বন্ধে তার খুব স্পষ্ট ধারণা নেই।

গিন্নীমা বল্লেন—ওকে নীচে ম্যানেজারের কাছে একদিন দেখা করতে বলো। যদি মুহুরীর কাজটাজ করতে পারে; তবে আমি আমার ছেলেকে বলে দোব এখন।

গিন্নীমার সুপারিশে গোকুল পনেরো টাকা মাইনের একটী চাকরী পেয়ে গেল। ওর বাংলা হাতের লেখা খুব ভাল, গ্রামে ওর হাতের লেখার খ্যাতি ছিল।

গোকুলের ইচ্ছা খোলার বাড়ীটা বদলায়, মা ওর কিন্তু এতে আপত্তি করলে, বল্লে—বাবা, এই খোলার বাড়ীই লক্ষ্মী—এ ছেড়ে কোথাও যাবো না। এ থেকে আরও উন্নতি হবে দেখিস তুই।

হোলও তাই। গোকুল পরের বৎসরই বিল-সরকারের পদে উন্নীত হোল। একাজে উপরি রোজগার খুব, দেনাদারেরা কিছু কিছু ঘুস দিয়ে নিজেদের বিলের ওয়াদা দেরীতে ফেরাতো। গোকুল মাসে ইচ্ছে করলে পঞ্চাশ টাকা অনায়াসে রোজগার করতে পারতো—কিন্তু ও স্টেটের মুখের দিকে চেয়ে কোথা-ও ঘুস নিত না। ফলে ওর আমলে টাকা বেশী আদায় হতে লাগলো। ম্যানেজারের নজর পড়ল ওর দিকে।

সংসার সেরেস্তার নায়েবের পদ খালি হোল ইতিমধ্যে। বুড়ো নায়েব নালু মুখুয্যের চোখের অসুখ হওয়ার দরুণ সে পেনসনের দরখাস্ত করলে। এই পদে মাসে একশো-দেড়শো টাকা কমিশন পাওয়া যায়, বিভিন্ন মুদী, খাবারওয়ালা, দোকানদারের কাছে। ন্যায্য ভাবেই এটা পাওয়া যায়, এতে ষ্টেটের কোনো অনিষ্ট নেই। একাজে একজন বিশ্বস্ত লোকেরই দরকার বটে।

ম্যানেজার একদিন ওকে ডেকে বল্লেন—গোকুল, সংসার সেরেস্তার নায়েবের কাজের জন্যে তুমি দরখাস্ত করেচ।

ও বল্লে, আজ্ঞে হাঁ বাবু।

ও দিয়েছিল কপাল ঠুকে একখান দরখাস্ত করে। অনেকেই তো সেরেস্তার করেচে। ম্যানেজার বল্লেন—তুমি কি পারবে? বড্ড হুঁসিয়ারি কাজ, আর বড় খাটুনি। গোকুল সাহস করে বল্লে—খাটুনির ভয় করিনে হুজুর। আর হুঁসিয়ারির কথা বলচেন, আপনি তো বিল আদায়ের কাজেও দেখেছেন আমায়।

আচ্ছা তুমি পাঁচশো টাকার একটা হ্যাণ্ডনোট লিখে দাও ষ্টেটের নামে। ও কাজে পাঁচশো টাকা ডিপজিট দিতে হবে তোমায়। তোমার মাইনে থেকে আমরা মাসে মাসে দশ টাকা কেটে নেবো হ্যাণ্ডনোটের দেনার দরুণ। তোমাকে আমি ও পোষ্ট দিলাম। মন দিয়ে কাজ কোরো।

গোকুল চোখে ঝাপ্‌সা দেখলে। ব্যাপার কি? সে স্বপ্ন দেখচে না তো? পঁচিশ টাকা মাইনের বিল সরকারী থেকে সে ষাট টাকা মাইনের সংসার সেরেস্তার নায়েবের পদে ঠেলে উঠলো এই এক বছরের মধ্যে—যে পদের উপরি কমিশনের আয় গড়ে মাসে দেড়শো টাকার কম নয়।

কিন্তু সত্যিই তার পরদিন তাকে ডেকে ম্যানেজার একখানা পাঁচশো টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নিয়ে ওকে গিয়ে সংসার সেরেস্তার গদিতে বস্‌তে আদেশ দিলেন।

সেদিন গোকুলের মা ঘটা করে সত্যনারায়ণের সিন্নি দিয়ে পাড়ার লোকদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালে। লোকজনের ভিড় কমে গেল, কাছে রমানাথ মণ্ডলের গলির বাঁড়ুয্যে বাড়ীর বড় বৌ গোকুলের মাকে এক পাশে ডেকে বল্লেন—মা, তোমাকে একটা অনুরোধ রাখতে

হবে। আমার মেয়ে রমাকে তো দেখেছ তুমি মিত্তির-বাড়ীতে ঠাকুর ঘরে? তাকে তোমায় নিতে হবে।

গোকুলের মা ভাবলে যে ভুল শুনচে। বাঁড়ুয্যের অবস্থা বেশ ভালই, মেয়েটিও সুন্দরী—কিছুদিন আগেও স্কুলের বাসে উঠে তাকে স্কুলে যেতে দেখা গিয়েছে দিব্যি পুতুলটীর মতো সেজে গুজে। আজ বাঁড়ুয্যের গিন্নী আপনা থেকে প্রস্তাব নিয়ে এসেচেন তার সঙ্গে গোকুলের বিয়ের?

সেই মোমের পুতুলের মত সুশ্রী মেয়েটীকে পুত্রবধূ করবার স্বপ্ন দেখ্‌তেও তো তার সাহস হয় না!

বাঁড়ুয্যে গিন্নী খুব হাঁটাহাঁটি আরম্ভ করলেন। একদিন সামাজিক ভাবে মেয়ে দেখাও হোল। মেয়েকে পছন্দ না করবার কোন কারণই থাকতে পারে না। বিয়ের প্রায় সব ঠিকঠাক, বাঁড়ুয্যের বাড়ী থেকে মেয়েরা দল বেঁধে পাত্র দেখতে এল। পাত্র গোকুল বিয়ের ব্যাপারে মুখে কিছু না বল্লেও মনে মনে খুসীই ছিল। মেয়েটী সত্যিই সুশ্রী, তার ওপর ভাল অবস্থাপন্ন ঘরের স্কুলে-পড়া মেয়ে—পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের ছেলে গোকুলের পক্ষে স্বপ্নের অতীত ওখানে বিয়ে হওয়া।

গোকুল মাকে বলে, ঠিকুজিখানা তো মা এখানে নেই, বাড়ীর বড় কাঁঠাল কাঠের সিন্দুকটাতে জমিজমার কাগজ-পত্তরের সঙ্গে এক বাণ্ডিলে বাঁধা আছে। আমি সেটা এই শনিবার গিয়ে রবিবার নিয়ে আসি। অনেক দিন দেশে যাওয়া হয়নি, অমনি বাড়ীঘর দেখেও আসা হবে এখন।

শনিবার দু'টোয় আফিস ছুটী হতেই গোকুল শেয়ালদহ স্টেসনে গিয়ে ট্রেণ ধরে বাড়ী রওনা হোল। এসেচে আজ তিন বছর দেশ থেকে, এর মধ্যে আর যাওয়ার অবকাশ ঘটেনি।

সন্ধ্যার কিছু আগে নিজের গাঁয়ে ঢুকতেই হাটতলার চারিদিক্

থেকে লোকে ওকে ছেঁকে ধরল। আজ শনিবার, গ্রামের হাট, সব লোকে আজ সেখানে জড় হয়েচে, শেষ হাটে জিনিষপত্র সস্তা হয় বলে অনেকেই বেলা শেষ করে তবে হাটে আসে।

—আরে গোকুল না? বেঁচে আছিস্? আমরা ভাবলাম—

—এতদিন কোথায় ছিলে গোকুল বাবাজি, তোমার মা কোথায়?

—এই যে গোকুল-দা, কোত্থেকে এ্যাদ্দিন পরে, সব ভালো তো?

নানা অধীর আগ্রহ ভরা প্রশ্নোত্তরের আদান প্রদান। গোকুলের বেশভূষা দেখে সবাই বুঝলে ওর নিশ্চয় ভাল চাকুরী হয়েচে কল্‌কাতায়। সবাই এই তিন বছরের ইতিহাস শোনবার জন্যে ব্যস্ত।

গোকুল তাদের হাত এড়িয়ে পৈত্রিক বাড়ীর চাবি খুল্‌লে। ঘর দোর বিশ্রী অপরিষ্কার হ'য়ে আছে। উঠানে বন জঙ্গল গজিয়েচে। জানালা দরজায় উই ধরেচে, কড়িকাঠে বাদুড় চামচিকের বাসা। পাশের বাড়ীর ছোট ছেলেকে ডেকে একটা হারিকেন লণ্ঠন চেয়ে আনলে ওদের বাড়ী থেকে। তক্তপোষটা থেকে একরাশ চামচিকের নাদি সরিয়ে সেখানে স্যুটকেস্‌টা রাখ্‌লে নামিয়ে।

একটু পরে তিনকড়ি মুখুয্যের ছেলে প্রমোদ তাকে ডাক্‌তে এলো। প্রমোদের বাড়ী যেতে গোকুলের যথেষ্ট সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল। এরই বোন, বীণার সঙ্গে গোকুলের একবার বিয়ের প্রস্তাব হ'য়েছিল বছর তিনেক আগে যে বছর ওরা কল্‌কাতায় যায়, সে বছর। গোকুল বলেছিল চাকুরী না পেয়ে সে বিয়ে করবে না।

বীণার বয়েস এখন হ'য়েচে ষোল-সতেরো। এখনো তার বিয়ে হয়নি, একথা গোকুল জানে। বীণাকে ছেলেবেলায় সে সঙ্গে করে নিয়ে কত বেড়িয়েচে, কুল পেড়ে দিয়েচে, কত শাসন করেচে, পাঠশালায় পড়া বলে দিয়েচে। বাড়ী থেকে যাবার আগে বীণা প্রায়ই ওদের

৯

বাড়ীতে আসতো যেতো, ওর সাথে গল্প করতো—কেবল বিয়ের প্রস্তাবের পরে তাকে আর বেশী দেখা যেতো না।

এতদিন পরে দেশে এসে বীণাদের বাড়ী যাওয়া একটা কর্ত্তব্য বটে, বীণার সঙ্গে দেখা করাও উচিত। কিন্তু যদি বীণার মা পুরোণো প্রস্তাবটী আবার পাড়েন? এখন তো চাকুরী করচে, এখন কোন ওজর থাকবার কথা তো নয়।

অথচ বীণাকে বিয়ে করবারও ইচ্ছা নেই।

গাড়াগাঁয়ের মেয়ে না জানে লেখাপড়া, না জানে গান, না জানে ভালো করে কথা কইতে। অবস্থাও খারাপ ওর বাপের—

রমাকে দেখবার পরে ওর মনে হয়েচে, এমন ধরণের মেয়েকে জীবনসঙ্গিনীরূপে লাভ করা একটা সৌভাগ্য। দেখবার মত মেয়ে; তার মায়েরও আন্তরিক ইচ্ছা তার বিয়ে হয় রমার সঙ্গে।

প্রমোদের মা যখন পরদিন সকালে কথাটা পাড়লেন, গোকুল তখন মায়ের কথাটাই বড় করে বল্লে। তার কোন হাত নেই। আচ্ছা, কলকাতায় গিয়ে মাকে জানাবে, পরে কি হয় পত্র লিখবে।

বীণা বোধহয় তখন জানালা ধরে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছিল—ওর কথা শেষ হতেই চলে গেল—কেউ টের পায়নি, কখন যে এসেছিল পাশের ঘরে—গোকুলের চোখ এড়ালো না।

তারপর যখন ওদের বাড়ী থেকে বার হ'য়ে আসে, তখন বীণার সঙ্গে আবার দেখা হো'ল বাড়ীর বাহিরে গোয়ালের দরজায়। গরুর দড়ি হাতে বীণা ওদের ছোট্ট বাছুরটা পেয়ারা গাছের গুঁড়িতে বাঁধচে। পরণে আধময়লা শাড়ী, গাছকতক কাঁচের চুড়ি হাতে, শ্যামবর্ণ মেয়ে, দেখ্‌তে এমন কিছু নয়; ওকে দেখে বীণা লজ্জায় চোখ তুলে যেন ভাল করে চাইতে পারলে না; কারণ তার আগেই বীণা শুনেচে মায়ের মুখে বিয়ের প্রস্তাবটা।

গোকুল দেখলে যখন দেখা হ'য়ে পড়লো তখন একটা কথাও না বলাটা ভাল দেখাবে না। বল্লে—বীণা, ভাল আছিস? ওঃ বেশ লম্বা হয়ে পড়েচিস যে!

বীণা সলজ্জ মুখে বল্লে—ভাল আছি – তুমি ভাল আছ গোকুল-দা?

—হ্যাঁ, মন্দ নয়।

—জ্যাঠাইমার শরীর ভাল আছে?

—মায়ের শরীর মন্দ না, তবে সেই বাতের ব্যাথা মাঝে মাঝে—

বীণা আর কিছু না বলে গোয়ালের মধ্যে ঢুকে গেল।

বিকেলের ট্রেণে গোকুল কলকাতায় রওনা হোল। চমৎকার ছায়াচ্ছন্ন বিকালটা গাড়ীর জানালার ধারে বসে বাইরের দিকে চেয়ে কেবলই বীণার কথা ওর মনে আসচে দেখে ও আশ্চর্য্য হোল। আজ সকালে বীণার সেই দীনমূর্ত্তি—পরণে আধময়লা শাড়ী, হাতে গাছকতক কাঁচের চুড়ি···

আরও দেখে আশ্চর্য্য হোল – ও ভাবচে, বীণার কোথায় বিয়ে হবে, কার ঘরে পড়বে অজ পাড়াগাঁয়ে—ওই বয়স, গোয়াল, গরু, ধান সেদ্ধ, ভাত রাঁধতেই জীবনটা কাটাবে। যখন বাপের পয়সার জোর নেই, জীবনে কিছুই দেখবে না, শুনবে না।

তার চেয়ে যদি ওকে বিয়ে করে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া যায়—থিয়েটার, বায়োস্কোপ, লোকজন—মাঝে মাঝে দোতালা বাস করে কালীঘাট কি দক্ষিণেশ্বর, যা কখনো বীণা দেখেনি—কি খুসিই হবে বীণা! জীবনে কখনো ওর হয়নি···রমা কলকাতার মেয়ে, কত দেখেচে, কত শুনেচে। তাকে আর নতুন কি দেখাবে ও।

কিন্তু সহানুভূতি বা দুঃখ-এক জিনিষ আর তা থেকে কাজের প্রেরণা পাওয়া সম্পূর্ণ অন্য—বিশেষতঃ স্বার্থপর যৌবন চায় যা নাগালের বাইরে

তাকে হাতে আঁকড়ে ধরতে, চায় তার রূপ, চায় উন্নতি, ছোট চায় বড়কে আয়ত্ত করার আত্মপ্রসাদ—

গোকুল বীণার চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালে।

কিন্নর দল

পাড়াটায় ছ'সাত ঘর ব্রাহ্মণের বাস মোট। সকলের অবস্থাই খারাপ। পরস্পর ঠকিয়ে, পরস্পরের কাছে ধার-ধোর করে এরা দিন গুজরান করে। অবিশ্যি কেউ কাউকে খুব ঠকাতে পারে না, কারণ সবাই বেশ হুঁসিয়ার। গরীব বলেই এরা বেশী কুচুটে ও হিংসুক, কেউ কারো ভাল দেখতে পারে না, বা কেউ কাউকে বিশ্বাসও করে না!

পূর্ব্বেই বলেচি, সকলের অবস্থা খারাপ, এবং খানিকটা তার দরুণ, খানিকটা অন্য কারণে সকলের চেহারা খারাপ। কিশোরী মেয়েদেরও তেমন লালিত্য নেই মুখে, ছোট ছোট ছেলেরা এমন অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন থাকে এবং এমন পাকা পাকা কথা বলে যে তাদের আর শিশু বা বালক বলে মনে হয় না। কাব্যে বা উপন্যাসে যে শৈশবকালের কতই প্রশস্তি পাঠ করা যায়, মনে হয় সে সব এদের জন্যে নয়, এরা মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে একেবারে প্রবীণত্বে পা দিয়েছে।

পাড়ার একঘর গৃহস্থ আছে, তারা এখানে থাকে না, তাদের কোঠাবাড়ীটা চাবি দেওয়া পড়ে আছে আজ দশ বারো বছর। এদের মস্ত বড় সংসার ছিল, এখন প্রায় সবাই মরে হেজে গিয়ে প্রায় পাঁচটি প্রাণীতে দাঁড়িয়েছে। বাড়ীর বড় ছেলে পশ্চিমে চাকুরী করে, মেজ ছেলে কলেজে পড়ে কলকাতায়, ছোট ছেলেটি জন্মাবধি কালা ও বোবা—পিসিমার কাছে থেকে মূক-বধির বিদ্যালয়ে পড়ে। বড় ছেলে বিবাহ

করেনি, যদিও তার বয়স ত্রিশ বত্রিশ হয়েছে, সে নাকি বিবাহের বিরোধী, শোনা যাচ্ছে যে এমনি ভাবেই জীবন কাটাবে।

পাড়ার মধ্যে এরাই শিক্ষিত ও স্বচ্ছল অবস্থার মানুষ। সে জন্যে এদের কেউ ভাল চোখে দেখে না, মনে মনে সকলেই এদের হিংসে করে এবং বড় ছেলে যে বিয়ে করবে না বলছে, সে সংবাদে পাড়ার সবাই পরম সন্তুষ্ট। যখন সবাই ছোট ও গরীব, তখন একঘর লোক কেন এত বাড় বাড়বে? বড় ছেলে বিয়ে করলেই ছেলেমেয়ে হয়ে জাজ্বল্যমান সংসার হবে দু'দিন পরে, সে কেউ সহ্য করতে পারবে না। মেজ ছেলে মোটে কলেজে পড়ছে, এখন সাপ হয় কি ব্যাং হয় তার কিছু ঠিক নেই, তার বিষয়ে দুশ্চিন্তার এখনও কারণ ঘটে নি, তার বয়েসও বেশী নয়।

মজুমদার-বাড়ীতে ভাঙ্গা রোয়াকে দুপুরে পাড়ার মেয়েদের মেয়ে-গজালি হয়। তাতে রায় গিন্নী, মুখুয্যে গিন্নী, বোস গিন্নী, চক্কত্তি গিন্নী, প্রভৃতি তো থাকেনই, পাড়ার অল্পবয়সী বৌয়েরা ও মেয়েরাও থাকে। সাধারণতঃ যে সব ধরণের চর্চ্চা এ মজলিসে হয়ে থাকে, তা শুনলে নারী-জাতি সম্বন্ধে লিখিত নানা সরস প্রশংসাপূর্ণ বর্ণনার সত্যতার সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ যাঁর উপস্থিত না হবে, তিনি নিঃসন্দেহে একজন খুব বড় ধরণের অপ্‌টিমিষ্ট।

আজ দুপুরে যে বৈঠক বসেছে, তাতে আলোচিত বিষয়গুলি থেকে মোটামুটি প্রতিদিনের আলোচনার ও বিতর্কের প্রকৃতি অনুমান করা যেতে পারে।

বোস গিন্নী বলছিলেন—আর বাপু দিচ্ছি তো রোজই, আমার গাছের কাঁটাল খেয়েই তো মানুষ, আমাদের যখন কাঁটাল পাড়ানো হয়, ছেলে-মেয়েগুলো হ্যাংলার মত তলায় দাঁড়িয়ে থাকে—যেয়ো কি ভুয়ো এক আধ-খানা যদি থাকে তো বলি, যা নিয়ে যা। তোদের নেই, যা খেগে যা। তা কি পোড়ার মুখে কোনদিন সুবাক্যি আছে? ওমা, আজ আমার

মেয়ে ছুটো নেবু তুলতে গিয়েছে ডোবার ধারের গাছে, তো বলে কিনা রোজ রোজ লেবু তুলতে আসে, যেন সরকারী গাছ পড়ে রয়েছে আর কি—চব্বিশ ঝুড়ি কথা শুনিয়ে দিলে মণ্টুর মা। আচ্ছা বলো তো তোমরাই—

মণ্টুর মা—যাঁকে উদ্দেশ্য করে একথা বলা হচ্ছিল, তিনি এদের মজলিসে কেবল আজই অনুপস্থিত আছেন নইলে রোজই এসে থাকেন। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে সবাই তাঁর চালচলন, ধরণ-ধারণ, রীতি-নীতির নানারূপ সমালোচনা করলে।

প্রিয় মুখুজ্যের মেয়ে শান্তি—ষোল সতেরো বছরের কুমারী—তার মায়ের বয়সী মণ্টুর মার সম্বন্ধে অমনি বলে বসলো—ওঃ, সে কথা আর বোলো না খুড়ীমা, কি ব্যাপক মেয়েমানুষ ঐ মণ্টুর মা! ঢের ঢের মেয়ে-মানুষ দেখিচি, অমন লঙ্কাপোড়া ব্যাপক যদি কোথাও দেখে থাকি, ক্ষুরে নমস্কার, বাবা বাবা!

ছোট মেয়ের ঐ জ্যাঠামি কথার জন্যে তাকে কেউ বকলে না বা শাসন করলে না বরং কথাটা সকলেই উপভোগ করলে।

তারপর কথাটার স্রোত আরও কতদূর গড়াতো বলা যায় না, এমন সময় রায়-বাড়ীর বড়বৌ হঠাৎ মনে-পড়ার ভঙ্গীতে বল্লেন—হাঁ, একটা মজার কথা শোননি বুঝি। শ্রীপতি যে বিয়ে করেচে, বটঠাকুরের কাছে চিঠি এসেচে, শ্রীপতির মামা লিখেচে। সকলে সমস্বরে বলে উঠলো—শ্রীপতি বিয়ে করেচে!

তারপর সকলেই একসঙ্গে নানারূপ প্রশ্ন করতে লাগলো:

—কোথায়, কোথায়?

—কবে চিঠি এল?

—তবে যে শুনলাম শ্রীপতি বিয়ে করবে না বলেচে!

শ্রীপতির বিয়ের খবরে অনেকেই যেন একটু দমে গেল। খবরটা

যারা অত বেলায় স্নান করছিল, তারা তখুনি পাড়ার মধ্যে গিয়ে খবরটা সবাইকে বল্লে। তখন কিন্তু কেউ এল না; অত বেলায় এখন শ্রীপতিদের বাড়ী গেলে তাদের খেতে বলতে হয়। অসময়ে এখন এসে তারা রান্নাবান্না চড়িয়ে খাবে, সেটা প্রতিবেশী হয়ে হতে দেওয়া কর্ত্তব্য নয় কিন্তু সে ঝঞ্চাট ঘাড়ে করবার চেয়ে এখন না যাওয়াই বুদ্ধির কাজ।

কিন্তু রাসু চক্কত্তি আর প্রিয় মুখুয্যের বাড়ীর মেয়েরা অত সহজে রেহাই পেলেন না। শ্রীপতি নিজে গিয়ে একেবারে অন্তঃপুরের মধ্যে ঢুকে বল্লে—ও-পিসিমা, ও-বৌদিদি, আপনারা আপনাদের বৌকে হাত ধরে ঘরে না তুললে কে আর তুলবে? আসুন সবাই।

বাধ্য হয়ে কাছাকাছির দু'তিন বাড়ীর মেয়েরা শাঁক হাতে, জলের ঘটি হাতে নতুন বৌকে ঘরে তুলতে এলেন—খানিকটা চক্ষুলজ্জায়, খানিকটা কৌতূহলে। মজা দেখবার প্রবৃত্তি সকলের মধ্যেই আছে। ছোটবড় ছেলেমেয়েও এল অনেকে, শান্তি এল, কমলা এল, সরলা এল।

শ্রীপতিদের বাড়ীর উঠোনে লিচুতলায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দূর থেকে মেয়েটির ধপধপে ফর্সা গায়ের রং ও পরণের দামী সিল্কের শাড়ী দেখে সকলে অবাক হয়ে গেল। সামনে এসে আরও বিস্মিত হবার কারণ ওদের ঘটলো মেয়েটির অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী দেখে। কি ডাগর ডাগর চোখ! কি সুকুমার লাবণ্য সারা অঙ্গে! সর্ব্বোপরি মুখশ্রী—অমন ধরণের সুন্দর মুখ এসব পাড়াগাঁয়ে কেউ কখনো দেখেনি।

সকলে আশা করেছিল গিয়ে দেখবে কালোকোলো একটা মোটামত মাগী আধ-ঘোমটা দিয়ে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্যাট প্যাট করে চেয়ে রয়েছে ওদের দিকে। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে দেখলে, এক নম্রমুখী সুন্দরী তরুণী মূর্ত্তি···। মুখখানি এত সুকুমার যে মনে হয় ষোল সতেরো বছরের বালিকা।

বিকেলে ওপাড়ার নিতাই মুখুয্যের বৌ ঘাটের পথে চক্কত্তি গিন্নীকে জিজ্ঞেস করলেন—

—কি দিদি, শ্রীপতির বৌ দেখলে নাকি? কেমন দেখতে?

চক্কত্তি গিন্নী বল্লেন—না, দেখতে বেশ ভালই—

চক্কত্তি গিন্নীর সঙ্গে শাস্তি ছিল, সে হাজার হোক্ ছেলে মানুষ, ভাল লাগলে পরের প্রশংসার বেলায় সে এখনও কার্পণ্য করতে শেখেনি, সে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলো—চমৎকার, খুড়ীমা, একবার গিয়ে দেখে আসবেন, সত্যিই অদ্ভুত ধরণের ভাল।

নিতাই মুখুয্যের বৌ পরের এতখানি প্রশংসা শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন না—বুঝতে পারলেন না শাস্তি কথাটা ব্যঙ্গের স্বরে বলছে না, সত্যিই বলছে। বল্লেন—কি রকম ভাল?

এবার চক্কত্তি গিন্নী নিজেই বল্লেন—না বৌ, যা ভেবেছিলাম তা নয়। বৌটি সত্যিই দেখতে ভাল। আর কেনই বা হবে না বলো, সহরের মেয়ে, দিনরাত সাবান ঘসছে, পাউডার ঘসছে, তোমার আমার মত রাঁধতে হোত, বাসন মাজতে হোত, তো দেখতাম চেহারার কত জলুস বজায় রাখে।

এই বয়সে তো দূরের কথা, তাঁর বিগত যৌবন দিনেও অজস্র পাউডার সাবান ঘসলেও যে কখনো তিনি শ্রীপতির বৌয়ের পায়ের নখের কাছে দাঁড়াতে পারতেন না—চক্কত্তি গিন্নীর সম্বন্ধে শাস্তির এ কথা মনে হোল। কিন্তু চুপ করে রইল সে।

বিকেলে এ পাড়ার ওপাড়ার মেয়েরা দলে দলে বৌ দেখতে এল। অনেকেই বল্লে, এমন রূপসী মেয়ে তারা কখনো দেখেনি। কেবল হরিচরণ রায়ের স্ত্রী বল্লেন, আর বছর তারকেশ্বরে যাবার সময় ব্যাণ্ডেল স্টেশনে তিনি একটি বৌ দেখেছিলেন, সেটি এর চেয়েও রূপসী।

মেয়ে-মজলিসে পরদিন আলোচনার একমাত্র বিষয় দাঁড়ালো শ্রীপতির

বৌ। দেখা গেল তার রূপ সম্বন্ধে দু-মত নেই সভ্যাদের মধ্যে, কিন্তু তার চরিত্র সম্বন্ধে নানারকম মন্তব্য অবাধে চলছে।

—ধরণ-ধারণ যেন কেমন কেমন—অত সাজগোজ কেন রে বাপু ?

—ভাল ঘরের মেয়ে নয়। দেখলেই বোঝা যায়—

—বাসন মাজতে হোলে ও হাত আর বেশীদিন অত সাদাও থাকবে না, নরমও থাকবে না—ঠ্যালা বুঝবেন পাড়াগাঁয়ের। গলায় নেক্‌লেস্ ঝুলুতে আমরাও জানি—

—বেশ একটু ঠ্যাকারে। পাড়াগাঁয়ের মাটিতে যেন গুমরে পা পড়ছে না, এমনি ভাব। বামুনের ঘরে বিয়ে হয়ে ভাবছে যেন কি—

—তা তো হবেই, বদ্দির বামুনের মেয়ে, বামুনের ঘরে এয়েছে, ওর সাতপুরুষের সৌভাগ্যি না ?

নববধূর স্বপক্ষে বল্লে—কেবল শান্তি ও কমলা। শান্তি ঝাঁঝের সঙ্গে বল্লে, তোমরা কারো ভালো দেখতে পার না বাপু! কেন ওসব বলবে একজন ভদ্দর ঘরের মেয়ের সম্বন্ধে ? কাল বিকেলে আমি গিয়ে কতক্ষণ ছিলাম নতুন বৌয়ের কাছে। কোন ঠ্যাকার নেই, অংখার নেই, চমৎকার মেয়ে !

কমলা বল্লে—আমাদের উঠতে দেয় না কিছুতেই—কত গল্প করলে, খাবার খেতে দিলে, চা করলে—আর খুব সাজগোজ কি করে ? সাদাসিদে শাড়ী সেমিজ পড়ে তো ছিল। তবে খুব ফর্সা কাপড়-চোপড়—ময়লা একেবারে দু'চোখে দেখতে পারে না—

শান্তি বল্লে, ঘরগুলো এরই মধ্যে কি চমৎকার সাজিয়েছে ! আয়না, পিক্‌চার, দোপাটি ফুলের তোড়া বেঁধে ফুলদানিতে রেখে দিয়েছে—শ্রীপতিদা'র বাপের জন্মে কখনো অমন সাজানো ঘরদোরে বাস করেনি—ভারী ফিটফাট গোছালো বৌটি—

দিন দুই পরে ডোবার ঘাটে নববধূকে একরাশ বাসন নিয়ে নামতে

দেখে সকলে অবাক হয়ে গেল। চারিদিকে বনে ঘেরা ঝুপসি আধ-অন্ধকার ডোবাটা যেন মেয়েটির স্নিগ্ধ রূপের প্রভায় এক মুহূর্ত্তে আলো হয়ে ওঠে, একথা যারা তখন ডোবার অন্যান্য ঘাটে ছিল, সবাই মনে মনে স্বীকার করলে। দৃশ্যটাও যেন অভিনব ঠেকলো সকলের কাছে, এমন একটা পচা এঁদো জঙ্গলে ভরা পাড়াগেঁয়ে ডোবার ঘাটে সাধারণতঃ কালোকোলো, আধ-ময়লা শাড়ীপরা শ্রীহীনা ঝি-বৌ বা ত্রিকালোত্তীর্ণা প্রৌঢ়া বিধবাদের গামছা পরিহিতা মূর্ত্তিই দেখা যায় বা দেখার আশা করা যায়—সেখানে এমন একটি আধুনিক ছাঁদে খোঁপা বাঁধা, ফর্সা শাড়ী ব্লাউজ-পরা, রূপকথার রাজকুমারীর মত রূপসী, নব-যৌবনা বধূ সজনেতলার ঘাটে বসে ছাই দিয়ে নিটোল সুগৌর হাতে বাসন মাজছে, এ দৃশ্যটা খাপ খায় না। সকলের কাছেই এটা খাপছাড়া বলে মনে হোল। প্রৌঢ়ারাও ভেবে দেখলেন গত বিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে এমন ঘটনা ঘটেনি এই ক্ষুদ্র ডোবার ইতিহাসে।

রায়পাড়ার একটি প্রৌঢ়া বল্লেন—আ-হা, বৌ তো নয়, যেন পিরতিমে—কিন্তু অত রূপ নিয়ে কি এই ডোবায় নামে বাসন মাজতে! না ওহাতে কখনো ছাই দিয়ে বাসন মাজা অভ্যেস আছে! হাত দেখেই বুঝেছি।

তারপর থেকে দেখা গেল ঘরসংসারের যা কিছু কাজ শ্রীপতির বৌ সব নিজের হাতে করচে।

ইতিমধ্যে শ্রীপতির কল্‌কাতায় বদ্‌লি হবার খবর আসতে সে চলে গেল বাড়ী থেকে।

পাড়ার মেয়েদের মধ্যে শান্তি ও কমলা শ্রীপতির বৌয়ের বড় ন্যাওটো হয়ে পড়লো। সকাল নেই বিকেল নেই, সব সময়েই দেখা যায় শান্তি ও কমলা বসে আছে ওখানে।

পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের মেয়ে, অমন আদর করে কেউ কখনো রোজ রোজ ওদের লুচি হালুয়া খেতে দেয় নি।

একদিন কমলা বলে—বৌদিদি, তোমার ঘরে কাপড় মোড়া ওটা কি ?

শ্রীপতির বৌ বল্লে—ওটা এসরাজ—

—বাজাতে জানো বৌদি ?

—একটুখানি অমনি জানি ভাই, কিন্তু এ্যাদ্দিন ওকে বার পর্য্যন্ত করিনি কেন জানো, গাঁয়ে-ঘরে কে কি হয়তো মনে করবে।

শান্তি বল্লে—নিজের বাড়ী বসে বাজাবে, কে কি মনে করবে ? একটু বাজিয়ে শোনাও না বৌদি ?

একটু পরে রায়গিন্নী ঘাটে যাবার পথে শুনতে পেলেন শ্রীপতির বাড়ীর মধ্যে কে বেহালা না কি বাজাচ্ছে, চমৎকার মিষ্টি ! কোনো ভিখিরী গান গাচ্ছে বুঝি ? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ শুনে তিনি ঘাটে চলে গেলেন।

ঘাটে গিয়ে তিনি মজুমদার বৌকে বল্লেন কথাটা।

—ওই শ্রীপতির বাড়ী কে একজন বোষ্টম এসে বেহালা বাজাচ্ছে শুনে এলাম। কি চমৎকার বাজাচ্ছে দিদি, দুদণ্ড দাঁড়িয়ে শুনতে ইচ্ছে করে।

দুপুরের মেয়ে-মজলিসে শান্তির মা বল্লেন—শ্রীপতির বৌ চমৎকার বাজাতে পারে এসরাজ না কি বলে, একরকম বেহালার মত। শান্তিদের ওবেলা শুনিয়েছিল—

রায় বৌ বল্লেন—ও ! তাই ওবেলা নাইতে যাবার সময় শুনলাম বটে ! সে যে ভারী চমৎকার বাজনা গো, আমি বলি বুঝি কোন ফকির বোষ্টম ভিক্ষে করতে এসে বাজাচ্ছে !

এমন সময় শান্তি আসতেই তার মা বল্লেন—ওই জিজ্ঞেস কর না শান্তিকে।

শান্তি বল্লে—উঃ সে আর তোমায় কি বলব খুড়ীমা, বৌদিদি যা

বাজালে অমন কখনো শুনিনি—শুনবে তোমরা ? তা'হোলে এখন বলি বাজাতে—বল্লেই বাজাবে।

শান্তি শ্রীপতিদের বাড়ী চলে যাবার অল্প পরেই শোনা গেল শ্রীপতির বৌয়ের এস্রাজ বাজনা। অনেকক্ষণ কারো মুখে কথা রইল না।

চক্কত্তি গিন্নী বল্লেন—আহা, বড় চমৎকার বাজায় তো !

সকলেই স্বীকার করলে শ্রীপতির বৌকে আগে যা ভাবা গিয়েছিল, সে-রকম নয়, বেশ মেয়েটি।

এস্রাজ বাজনার মধ্যে দিয়ে পাড়ার সকলের সঙ্গে শ্রীপতির বৌয়ের সহজ ভাবে আলাপ পরিচয় জমে উঠলো। দুপুরে, সন্ধ্যায় প্রায়ই সবাই যায় শ্রীপতিদের বাড়ী বাজনা শুনতে।

তারপর গান শুনলো সবাই একদিন। পূর্ণিমার রাত্রে জোৎস্নাভরা ভেতর বাড়ীর রোয়াকে বসে বৌ এস্রাজ বাজাচ্ছিল, পাড়ার সব মেয়েই এসে জুটেচে। শ্রীপতি বাড়ী নেই।

কমলা বল্লে—আজ বৌদি একটা গান গাইতেই হবে—তুমি গাইতেও জানো ঠিক—শোনাও আজগে—

বৌটি হেসে বল্লে—কে বলেচে ঠাকুরঝি যে আমি গাইতে জানি ?

—না, ওসব রাখো—গাও একটা—

সকলেই অনুরোধ করলে। বল্লে—গাও বৌমা, এ পাড়ায় মানুষ নেই, আস্তে আস্তে গাও, কেউ শুনবে না—

শ্রীপতির বৌ একখানা মীরার ভজন গাইলে।

রাণাজি, ম্যয় গিরধর কে ঘর যাঁহু
গিরধর ম্হারা সাচো প্রিতম্ দেখত রূপ লুভাঁউ।

গায়িকার চোখে মুখে কি ভক্তিপূর্ণ তন্ময়তার শোভা ফুটে উঠলো গানখানা গাইতে গাইতে—শান্তি একটা গন্ধরাজ আর টগরের মালা গেঁথে এনেছিল বৌদিকেই পরাবে বলে—গান গাইবার সময়ে সে

আবার সেটা বৌয়ের গলায় আল্‌গোছে পরিয়ে দিলে—সেই জ্যোৎস্নায় সাদা সুগন্ধি ফুলের মালা গলায় রূপসী বৌয়ের মুখে ভজন শুনতে শুনতে মণ্টুর মার মনে হলো এই মেয়েটিই সেই মীরাবাই, অনেককাল পরে পৃথিবীতে আবার নেমে এসেছে, আবার সবাইকে ভক্তির গান গাইয়ে শোনাচ্ছে।

মণ্টুর মা একটু একটু বাইরের খবর রাখতেন, যাত্রায় একবার মীরাবাই পালা দেখেছিলেন তাঁর বাপের বাড়ীর দেশে।

তারপর আরি একখানা হিন্দীগান গাইলে বৌ, এঁরা অবশ্যি কিছু বুঝলেন না। তবে তন্ময় হয়ে শুনলেন বটে।

তারপর একখানা বেহাগ। বাংলা গান এবার। সকলে শুয়ে পড়লো—শান্তির চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। অনেকে দেখলে বৌয়েরও চোখ দিয়ে জল পড়ছে গান গাইতে গাইতে—রূপসী গায়িকা একেবারে যেন বাহ্যজ্ঞান ভুলে গিয়েছে গানে তন্ময় হয়ে।

সেদিন থেকেই সকলে শ্রীপতির বৌকে অন্য চোখে দেখতে লাগলো।

ওর সম্বন্ধে ক্রমে উচ্চধারণা করতে সকলে বাধ্য হোল আরও নানা ঘটনায়। পাড়াগাঁয়ে সকলেই বেশ হুঁসিয়ার, একথা আগেই বলেছি। ধার দিয়ে—সে যদি এক খুঁচি চাল কি দু পলা তেলও হয়—তার জন্যে দশবার তাগাদা করতে এদের বাধে না। কিন্তু দেখা গেল শ্রীপতির বৌ সম্পূর্ণ দিলদরিয়া মেজাজের মেয়ে। দেবার বেলায় সে কখনও না বলে কাউকে ফেরায় না, যদি জিনিষটা তার কাছে থাকে। একেবারে মুক্তহস্ত সে বিষয়ে কিন্তু আদায় করতে জানে না, তাগাদা করতে জানে না, মুখে তার রাগ নেই, বিরক্তি নেই, হাসিমুখ ছাড়া তার কেউ কখনো দেখে নি।

শ্রীপতির বৌয়ের আপনপর জ্ঞান নেই, এটাও সবাই দেখলে। পাশের বাড়ীতে চক্কত্তি গিন্নী বিধবা, একাদশীর দিন দুপুরে তিনি নিজের

ঘরে মাদুর পেতে শুয়ে আছেন, শ্রীপতির বৌ একবাটি তেল নিয়ে এসে তাঁর গায়ে মালিশ করতে বসে গেল। যেন ও তাঁর নিজের ছেলের বৌ।

চক্কত্তি গিন্নী একটু অবাক হোলেন প্রথমটা। পাড়াগাঁয়ে এরকম কেউ করে না, নিজের ছেলের বৌয়েই করে না তো অপরের বৌ!

—এসো, এসো, মা আমার এসো। থাক্ তেল মালিশ আবার কেন মা? তোমায় ওসব করতে হবে না, পাগলী মেয়ে—

এই পাগলী মেয়েটি কিন্তু শুনলে না। সে জোর করেই বসে গেল তেল মালিশ করতে। মাথার চুল এসে আগোছালো ভাবে উড়ে পড়েছে মুখে, সুগৌর মুখে অতিরিক্ত গরমে ও শ্রমে কিছু কিছু ঘাম দেখা দিয়েছে—চক্কত্তি গিন্নী এই সুন্দরী বৌটির মুখ থেকে চোখ যেন অন্যদিকে ফেরাতে পারলেন না। বড় স্নেহ হোল এই আপন-পর জ্ঞান-হারা মেয়েটার ওপর।

ইতিমধ্যে কমলার বিয়ে হয়ে গেল। শ্বশুর বাড়ী যাবার সময়ে সে শ্রীপতির বৌয়ের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বল্লে—বৌদিদি, তোমায় কি করে ছেড়ে থাকবো ভাই? মাকে ছেড়ে যেতে যত কষ্ট না হচ্ছে, তত হচ্ছে তোমায় ছেড়ে যেতে! এই এক ব্যাপার থেকেই বোঝা যাবে শ্রীপতির বৌ এই অল্প কয়েক মাসের মধ্যে গ্রামের তরুণ মনের ওপর কি রকম প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পূজার সময় এসে পড়েচে। আশ্বিনের প্রথম, শরতের নীল আকাশে অনেকদিন পরে সোনালি রোদের মেলা, বনসিমের ফুল ফুটেছে ঝোপে ঝোপে, নদীর চরে কাশ ফুলের শোভা। পাশের গ্রাম সত্রাজিৎপুরে বাঁড়ুয্যে বাড়ী পুজো হয় প্রতি বৎসর, এবারও শোনা যাচ্ছে মহানবমীর দিন তাদের বাড়ী আর বছরের মত যাত্রা হবে কাঁচড়াপাড়ার দলের।

শ্রীপতির বৌ গান-পাগলা মেয়ে, এ কথাটা এতদিনে এ গাঁয়ের

সবাই জেনেছে। তার দিন নেই, রাত নেই, গান লেগে আছে, দুপুরে রাত্রে রোজ এস্রাজ বাজায়। গান সম্বন্ধে কথা সর্ব্বদা তরে মুখে। শান্তির এখনও বিয়ে হয়নি, যদিও সে কমলার বয়সী। সে শ্রীপতির বৌয়ের কাছে আজকাল দিনরাত লেগে থাকে গান শিখবার জন্যে।

একদিন শ্রীপতির বৌ তাকে বল্লে—ভাই শান্তি, এক কাজ করবি, সত্রাজিৎপুরে তো যাত্রা হবে বলে সবাই নেচেছে। আমাদের পাড়ার মেয়েরা তো আর তা দেখতে পাবে না? তারা কি আর অপর গাঁয়ে যাবে যাত্রা শুনতে? অথচ এরা কখনো কিছু শোনে না—আহা! এদের জন্যে যদি আমরা আমাদের পাড়াতেই থিয়েটার করি?

শান্তি তো অবাক্! থিয়েটার! তাদের এই গাঁয়ে? থিয়েটার জিনিষটার নাম শুনেছে বটে সে, কিন্তু কখনো দেখেনি। বল্লে—কি করে করবে বৌদি, কি যে তুমি বলো! তুমি একটা পাগল!

শ্রীপতির বৌ হেসে বল্লে—সে সব বন্দোবস্ত আমি করবো এখন। তোকে ভেবে মরতে হবে না—ছাখ্ না কি করি।

সপ্তাহখানেক পরে শ্রীপতি যেমন শনিবারের দিন বাড়ী আসে তেমনি এল। সঙ্গে তিনটি বড় মেয়ে ও দুটী ছোট মেয়ে ও চার পাঁচটি ছেলে। বড় মেয়ে তিনটির ষোল, সতেরো এমনি বয়েস, সকলেই ভারী সুন্দরী, ছোট মেয়ে দুটির মধ্যে যেটির বয়েস বছর তেরো, সেটি তত সুবিধে নয় কিন্তু যেটির বয়েস আন্দাজ দশ—তাকে দেখে রক্ত মাংসের জীব বলে মনে হয় না, মনে হয় যেন মোমের পুতুল। ছেলেদের বয়েস পনেরোর বেশী নয় কারো। সকলেই সুবেশ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

শান্তি, শান্তির মা এবং চক্কত্তি গিন্নী তখন সেইখানেই উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপতির বৌ ওদের দেখে ছুটে গেল রোয়াক থেকে উঠোনে নেমে। উচ্ছ্বসিত আনন্দের সুরে বল্লে—এই যে রমা, পিন্টু, তারা, এই

যে শিবু আয়, আয় সব, কেমন আছিস্? ওঃ কতদিন দেখিনি তোদের—

রমা বলে যোল সতেরো বছরের সুন্দরী মেয়েটি ওর গলা জড়িয়ে ধরলে, সকলেই ওকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলে।

—দিদি কেমন আছিস্ ভাই—

—একটু রোগা হয়ে গেছিস্ দিদি—

—ওঃ কতদিন যে তোকে দেখিনি—

—দাদাবাবু যখন বল্লেন তোর এখানে আসতে হবে আমরা তো—

—আহিরীটোলাতে মিউজিক কম্পিটিশন ছিল—নাম দিয়েছিলাম—ছেড়ে চলে এলাম—

মেয়েগুলির মুখ, রং, গড়ন শ্রীপতির বৌয়ের মত। রমা তো একেবারে হুবহু ওর মত দেখতে, কেবল যা কিছু বয়েসের তফাৎ। জানা গেল মেয়ে দুটির মধ্যে রমা ও তার ছোট সতী, এবং ছেলেদের মধ্যে বারো বছরের ফুটফুটে ছেলে শিবু শ্রীপতির বৌয়ের আপন ভাই বোন্, বাকী সবাই কেউ খুড়তুতো, কেউ জ্যাঠতুতো ভাই বোন্।

ক্রমে আরও জানা গেল শ্রীপতির বৌ এদের চিঠি লিখিয়ে আনিয়েচে থিয়েটার করানোর জন্যে।

পাড়ার সবাই এদের রূপ দেখে অবাক্। এসব পাড়াগাঁয়ে অমন চেহারার ছেলে মেয়ে কেউ কল্পনাই করতে পারে না। দশ বছরের সেই ছেলেটার নাম পিন্টু, সে শান্তির বড় স্তাওটা হয়ে গেল। সে আবার একটা সাঁতার দেবার নীল রঙের পোষাক এনেছে, সিক্ত নীল পোষাক, সুগৌর দেহ যখন সে নদীর ঘাটে স্নান করে উঠে দাঁড়ায়—তখন ঘাটশুদ্ধ মেয়েরা—বোস্ গিন্নী, মন্টুর মা, শান্তির মা, মজুমদার গিন্নী ওর দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকেন। রূপ আছে বটে ছেলেটির! শান্তি দস্তুরমত গর্ব্ব অনুভব করে, যখন পিন্টু অনুযোগ

করে বলে—আঃ শান্তিদি, আসুন না উঠে, ভিজে কাপড়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌বো ? আসুন বাড়ী যাই।

পুজো এসে পড়লো। এ-গাঁয়ে কোনো উৎসব নেই পুজোয়, গরীবদের গাঁয়ে পুজো কে করবে ? দূর থেকে সত্রাজিৎপুরের বাঁড়ুয্যে-বাড়ীর ঢাক শুনেই গাঁয়ের মেয়েরা সন্তুষ্ট হয়। ভিন্ গাঁয়ে গিয়ে মেয়েদের পুজো দেখবার রীতি না থাকায় অনেকে দশ-পনেরো কি বিশ বছর দুর্গা প্রতিমা পর্য্যন্ত দেখেনি। মেয়েদের জীবনে কোনো উৎসব আমোদ নেই এ গাঁয়ে।

শ্রীপতির বৌ তাই একদিন শান্তিকে বলেছিল—সত্যি কি করে যে তোরা থাকিস্ ঠাকুরঝি—একটু গান নেই, বাজনা নেই, বই পড়া নেই, মানুষে যে কেমন করে থাকে এমন করে !

বোধ হয় সেই জন্যেই এত উৎসাহের সঙ্গে ও লেগেছিল থিয়েটারের ব্যাপারে।

শ্রীপতিদের বাড়ীর লম্বা বারান্দার একধারে তক্তপোষ পেতে দড়ি টাঙিয়ে হল্‌দে শাড়ী ঝুলিয়ে ষ্টেজ করা হয়েছে।

শ্রীপতির বৌ ভাই বোনদের নিয়ে সকাল থেকে খাটচে।

শান্তি বল্লে—তুমি এতো জানলে কি করে বৌদি ?

রমা বল্লে—তুমি জানো না দিদিকে শান্তিদি। দিদি অল্ বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশনে—

শ্রীপতির বৌ ধমক দিয়ে বোনকে থামিয়ে দিয়ে বল্লে—নে, নে—যা, অনেক কাজ বাকী, এখন তোর অত বক্তৃতা করতে হবে না দাঁড়িয়ে—

রমা না থেমে বল্লে—আর খুব ভাল পার্ট করার জন্তেও সোনার মেডেল পেয়েছে—যতবার পয়লা বোশেখের দিন আমাদের বাড়ীতে

থিয়েটার হয়, দিদিই তো তার পাণ্ডা – জানো আমাদের কি নাম দিয়েছেন জ্যাঠামশায় ?

শ্রীপতির বৌ বল্লে—আবার ?

রমা হেসে থেমে গেল।

মহাষ্টমীর দিন আজ। শুধু মেয়েদের ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে থিয়েটার। দেখবে শুধু মেয়েরাই—সমস্ত পাড়া কুড়িয়ে সব মেয়ে এসে জুটেছে থিয়েটার দেখতে।

ছোট্ট নাটকটি। শ্রীপতির বৌয়ের জ্যাঠামশাইয়ের নাকি লেখা। রাজকুমারকে ভালবেসেছিল তাঁরই প্রাসাদের একজন পরিচারিকার মেয়ে। ছেলেবেলায় দু'জনে খেলা করেছে। বড় হয়ে দিগ্বিজয়ে বেরুলেন রাজপুত্র, অন্য দেশের রাজকুমারী ভদ্রাকে বিবাহ করে ফিরলেন। পরিচারিকার মেয়ে অনুরাধা তখন নব যৌবনা কিশোরী, বিকশিত মল্লিকা-পুষ্পের মত শুভ্র, পবিত্র। খুব ভাল নাচতে গাইতে শিখেছিল সে ইতিমধ্যে। রাজধানীর সবাই তাকে চেনে জানে—নৃত্যের অমন রূপ দিতে কেউ পারে না। এদিকে ভদ্রাকে রাজ্যে এনে রাজকুমার এক উৎসব করলেন। সে সভায় অনুরাধাকে নাচতে গাইতে হোল রাজপুত্রের সামনে ভাড়া করা নর্ত্তকী হিসেবে। তার বুক ফেটে যাচ্চে, অথচ সে একটা কথাও বল্লে না, নৃত্যের মধ্যে দিয়ে, সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে জীবনের ব্যর্থ প্রেমের বেদনা সে নিবেদন করলে প্রিয়ের উদ্দেশ্যে। তারপরে কাউকে কিছু না বলে দেশ ছেড়ে পরদিন একা কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

শ্রীপতির বৌ অনুরাধা ; রমা ভদ্রা। ওর অন্য সব ভাই বোনেরাও অভিনয় করলে। শ্রীপতির বৌ বেশভূষায়, রূপে, গলে দোদুল্যমান যুঁইফুলের মালায় যেন প্রাচীন যুগের রূপকথার রাজকুমারী, রমাও তাই, গানে গানে অনুরাধা তো ষ্টেজ্ ভরিয়ে দিলে, আর কি অপূর্ব্ব নৃত্য-

ভঙ্গি! সতী, রমা, পিন্টুও কি চমৎকার অভিনয় করলে, আর কি চমৎকার মানিয়েছে ওদের!

তারপরে বহুকাল পরে পথের ধারে মুমূর্ষু অনুরাধার সঙ্গে রাজপুত্রের দেখা। সে বড় মর্ম্মস্পর্শী করুণ দৃশ্য! অনুরাধার গানের করুণ সুরপুঞ্জে ঘরের বাতাস ভরে গেল। চারিদিকে শুধু শোনা যাচ্ছিল কান্নার শব্দ, শান্তি তো ফুলে ফুলে কেঁদে সারা।

অভিনয় শেষ হোল, তখন রাত প্রায় এগারোটা। গ্রামের মেয়েরা কেউ বাড়ী চলে গেল না। তারা শ্রীপতির বৌকে ও রমাকে অভিনয়ের পর আবার দেখতে চায়। শ্রীপতির বৌ ও তার ভাইবোনেদের রান্না ঘরে নিয়ে গিয়ে চক্কত্তি গিন্নী ও শান্তির মা ও মন্টুর মা খেতে বসিয়ে দিলেন আর ওদের চারিধার দিয়ে পাড়ার যত মেয়ে।

ওপাড়ার রাম গাঙুলির বৌ বল্লেন—বৌমা যে আমাদের এমন তা তো জানিনে! ওমা এমন জীবনে তো কখনো দেখিনি—

মন্টুর মা বল্লেন—আর ভাইবোনগুলিও কি সব হীরের টুকরো! যেমন সব চেহারা তেমনি গান,—

শান্তি তো তার বৌদিদির পিছুপিছু ঘুরছে, তার চোখ থেকে অভিনয়ের ঘোর এখনও কাটেনি, সেই যুঁইফুলের মালাটি বৌদির গলা থেকে সে এখনও খুলতে দেয় নি। ওর দিক থেকে অন্যদিকে সে চোখ ফেরাতে পারচে না যেন।

চক্কত্তি গিন্নী বল্লেন—আর কি গলা আমাদের বৌমার আর রমার! পিন্টু অতটুকু ছেলে, কি চমৎকার করলে!···

শান্তির মা বল্লেন—পিন্টু খাচ্ছে না, ছাখো সেজ বৌ। আর একটু দুধ দি, ভাত ক'টা মেখে নাও বাবা, চেঁচিয়ে তো ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছে। ···কি চমৎকার মানিয়েছিল পিন্টুকে, না সেজ বৌ?—একে ফুটফুটে সুন্দর ছেলে···

শ্রীপতির বৌ হাজার হোক্ ছেলেমানুষ, সকলের প্রশংসায় সে এমন খুশী হয়ে উঠলো যে খাওয়াই হোল না তার। সলজ্জ হেসে বল্লে—জ্যাঠামশায় আমাদের বলেন কিন্নর দল—এখন ওই নামে আমাদের—

রমা হেসে ঘাড় দুলিয়ে বল্লে—নিজে যে বল্লে দিদি, আমি বলতে যাচ্ছিলুম, আমায় তবে ধমক দিলে কেন তখন ?

তারা বল্লে—নামটি বেশ কিন্নর দল, না ? আমাদের শ্যামবাজারের পাড়ায় কিন্নর দল বলতে সবাই চেনে।

রমা বল্লে, কৃত্রিম গর্ব্বের সঙ্গে—প্রায় এক ডাকে চেনে—হুঁ হুঁ—

তারপর এই রূপবান বালক বালিকার দল, সকলে একযোগে হঠাৎ খিল্‌খিল্ করে মিষ্টি হাসি হেসে উঠ্‌লো।

সতী হাসতে হাসতে বল্লে—বেশ নামটি, কিন্নর দল, না ?

এমন একদল সুশ্রী চেহারার ছেলেমেয়ে, তার ওপর তাদের এমন অভিনয় করার ক্ষমতা, এমন গানের গলা, এমনি হাসিখুসি মিষ্টি স্বভাব, সকলেরই মনোহরণ করবে তার আশ্চর্য্য কি ?

মন্টুর মা ভাবলেন কিন্নর দলই বটে !···

ওদের খেতে খেতে হাসি গল্প করতে মহাষ্টমীর নিশি প্রায় ভোর হয়ে এল।

শ্রীপতির বৌ বল্লে, আসুন, বাকী রাতটুকু আর সব বাড়ী যাবেন কেন ? গল্প করে কাটানো যাক্ !

শ্রীপতি বাড়ী নেই, সে সত্রাজিৎপুরের বাঁড়ুয্যে বাড়ীর নিমন্ত্রণে গিয়েছে, আজ রাত্রে যাত্রা দেখে সকালে ফিরবে। সেইজন্যে সকলে বল্লে, তা ভাল, কিন্তু বৌমা তোমাকে গান গাইতে হবে !

শান্তি বল্লে—বৌদি, অনুরাধার সেই গানটা গাও আর একবার, আহা, চোখে জল রাখা যায় না শুনলে।

শ্রীপতির বৌ গাইলে, রমা এস্রাজ বাজালে। তারপর রমা ও তারা এক সঙ্গে গাইলে।

একটিমাত্র তেড়ো-পাখী বাঁশ গাছের মগ্‌ডালে কোথায় ডাকতে আরম্ভ করেছে। রাত ফরসা হ'ল।

সে মহাষ্টমীর রাত্রি থেকে গ্রামের সবাই জানলে শ্রীপতির বৌ কি ধরণের মেয়ে।

কেবল তারা জানলে না যে শ্রীপতির বৌ প্রতিভাশালিনী গায়িকা, সত্যিকার আর্টিষ্ট। সে ভালবেসে শ্রীপতিকে বিয়ে করে এই পাড়াগাঁয়ের বনবাস মাথায় করে নিয়ে, নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছেড়েচে, যশের আশা, অর্থের আশা, আর্টের চর্চ্চা পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছে। তবু গানের ঝোঁক ওকে ছাড়ে না—ভুতে পাওয়ার মত পেয়ে বসে—দিনরাত তাই ওর মুখে গান লেগেই আছে, তাই আজ মহাষ্টমীর দিন সেই নেশার টানেই এই অভিনয়ের আয়োজন করেচে।

শান্তি কিছুতেই ছাড়তে চায় না ওকে! বলে তুমি কোথাও যেও না বৌদিদি, আমি মরে যাবো, এখানে তিষ্ঠুতে পারবো না। শান্তি আজকাল শ্রীপতির বৌয়ের কাছে গান শেখে, গলা মন্দ নয় এবং একদিকে খানিকটা গুণ থাকায় সে এরই মধ্যে বেশ শিখে ফেলেচে। কিছু কিছু বাজাতেও শিখেচে। গান বাজনায় আজকাল তার ভারী উৎসাহ। শ্রীপতির বৌ তো গান বাজনা যদি পেয়েছে, আর বড় একটা কিছু চায় না, শান্তির সঙ্গীত শিক্ষা নিয়েই সে সব সময় মহাব্যস্ত।

অগ্রহায়ণ মাসের দিকে বৌয়ের বাড়ী থেকে চিঠি এল রমা কি হয়ে হঠাৎ মারা গিয়েচে। শ্রীপতি কলকাতা থেকে সংবাদটা নিয়ে এল। শ্রীপতির বৌ খুব কান্নাকাটি করলে। পাড়াশুদ্ধ সবাই চোখের জল ফেললে ওকে সান্ত্বনা দিতে এসে।

শান্তি সব সময় বৌদির কাছে কাছে থাকে আজকাল। তাকে

একদিন শ্রীপতির বৌ বল্লে—জানিস্, শান্তি, আমাদের কিন্নরের দল ভাঙতে সুরু করেছে, রমাকে দিয়ে আরম্ভ হয়েছে, আমার মন যেন বলছে···

শান্তির বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো, ধমক দিয়ে বল্লে, থাক্ ওসব, কি যে বল বৌদি!

কিন্তু শ্রীপতির বৌয়ের কথাই খাটলো।

সে ঠিকই বলেছিল, শান্তি ঠাকুরঝি, কিন্নরের দলে ভাঙন ধরেছে।

রমার পরে ফাল্গুন মাসের দিকে গেল পিণ্টু বসন্ত রোগে। তার আগেই শ্রীপতির বৌ মাঘমাসে বাপের বাড়ী গিয়েছিল, শ্রাবণ মাসের প্রথমে প্রসব করতে গিয়ে সেও গেল।

এ সংবাদ গ্রামে যখন এল, শান্তি তখন সেখানে ছিল না, সেই বোশেখ মাসে তার বিবাহ হওয়াতে সে তখন ছিল মেটিরি বাণপুর, ওর শ্বশুর বাড়ীতে। গ্রামের অন্য সবাই শুনলে, অনাত্মীয়ের মৃত্যুতে খাঁটি অকৃত্রিম শোক এ রকম এর আগে কখনো এ গাঁয়ে করতে দেখা যায় নি। রায় গিন্নী, চক্কত্তি গিন্নী, শান্তির মা, মণ্টুর মা কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন। ঐ মেয়েটি কোথা থেকে দু'দিনের জন্য এসে তার গানের সুরের প্রভাবে সকলের অকরুণ, কুটিল ভাবে পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছিল, সে পরিবর্ত্তন যে কতখানি, ওই সময়ে গাঁয়ের মেয়েদের দেখলে বোঝা যেতো। ওদের চক্কত্তি বাড়ীর দুপুর বেলার আড্ডায়, স্নানের ঘাটে শ্রীপতির বৌয়ের কথা ছাড়া অন্য কথা ছিল না।

চক্কত্তি গিন্নী শোক পেয়েছিলেন সকলের চেয়ে বেশী। শ্রীপতির বৌয়ের কথা উঠলেই তিনি চোখের জল সামলাতে পারতেন না। বলতেন, দু'দিনের জন্যে এসে মা আমার কি মায়াই দেখিয়ে গেল! আমার পেটের মেয়ে অমন ককৃখনো করেনি···আহা! আমার পোড়া কপাল, সে কখনো এ কপালে টেঁকে!

মন্টুর মা বলতেন, সে কি আর মানুষ! দেবী অংশে ওসব মেয়ে জন্মায়। নিজের মুখেই বলতো হেসে হেসে, 'আমরা কিন্নরের দল খুড়ীমা' শাপভ্রষ্ট কিন্নরীই তো ছিল।···যেমন রূপ, তেমনি স্বভাব, তেমনি গান··· ওকি আর মানুষ, মা!

কথা বলতে বলতে মন্টুর মার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তো।

এসবের মধ্যে কেবল কথা বলতো না শান্তি। তার বিবাহিত জীবন খুব সুখের হয়নি, ভেবেছিল বাপের বাড়ী এসে বৌদিদির সঙ্গে অনেকখানি জ্বালা জুড়োবে। পুজোর পরে কার্ত্তিক মাসের প্রথমে বাপের বাড়ী এসে সে সব শুনেছিল। বৌদিদি যে তার জীবন থেকে কতখানি হরণ করে নিয়ে গিয়েছে, তা এরা কেউ জানে না। মুখে সে সব পাঁচজনের সামনে ভ্যাজ্ ভ্যাজ্ করে বলে লাভ কি? কি বুঝবে লোকে?

··· ··· ···

বছর দুই পরে একদিনের কথা। গাঁয়ের মধ্যে শ্রীপতির বৌয়ের কথা অনেকটা চাপা পড়ে গিয়েছে। শ্রীপতিও অনেকদিন পরে আবার গ্রামের বাড়ীতে যাওয়া আসা করছে শনিবারে কিংবা ছুটিছাটাতে।

শ্রীপতিদের বাড়ী থেকে শান্তিদের বাড়ী বেশী দূর নয়, দু'খানা বাড়ীর পরেই। শান্তি তখন এখানেই ছিল। অনেক রাত্রে সে শুনলে শ্রীপতি দাদাদের বাড়ীতে কে গান গাইচে। ঘুমের মধ্যে গানের সুর কানে যেতেই সে ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসলো—

বিরহিনী মীরা জাগে তব অনুরাগে, গিরিধর নাগর—

এ কার গলা? ওর গা শিউরে উঠলো। ঘুমের ঘোর এক মুহূর্ত্তে ছুটে গেল। কখনো সে ভুলবে জীবনে এ গান, এ গলা? সেই প্রথম পরিচয়ের দিনে ওদের রোয়াকে জ্যোস্না রাত্রে বসে এই গানখানাই বৌদিদি প্রথম গেয়েছিল! সেই অপূর্ব্ব করুণ সুর, গানের সুরের প্রতি মোচড়ে যেন একটি বিষণ্ণ আকাঙ্খার প্রাণঢালা আত্মনিবেদন! এ কি

আর কারো গলার—ওর কুমারী জীবনের আনন্দভরা দিনগুলির কত অবসর প্রহর যে এ কণ্ঠের সুরে মধুময়!

ও পাগলের মত ছুটে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো।

রাত অনেক। কৃষ্ণাতৃতীয়ার চাঁদ মাথার ওপর পৌঁছেচে। ফুট্‌ফুটে শরতের জ্যোৎস্নায় বাঁশবনের তলা পর্য্যন্ত আলো হয়ে উঠেছে।

ঠিক যেন তিন বছর আগেকার সেই মহাষ্টমীর রাত্রির মত।

শান্তির মা ইতিমধ্যে জেগে উঠে বল্লেন, ও কে গান করছে রে শান্তি? তারপর তিনিও তাড়াতাড়ি বাইরে এলেন। শ্রীপতিদের বাড়ী তো কেউ থাকে না, গান গাইবে কে? ওদিকে মণ্টুর মা, মণি বাদল সবাই জেগেছে দেখা গেল।

প্রথমটা এরা সবাই ভয়ে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। পরে ব্যাপারটা বোঝা গেল। শ্রীপতি কখন রাতের ট্রেণে বাড়ী এসেছিল, কেউ লক্ষ্য করেনি। সে কলের গান বাজাচ্ছে। ওদের সাড়া পেয়ে সে বাহিরে এসে বল্লে—আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে আজ চেয়ে আনলুম ওর গানখানা। মরবার ক'মাস আগে রেকর্ডে গেয়েছিল।

সবাই খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। শান্তি প্রথমে সে নীরবতা ভঙ্গ করে আস্তে আস্তে বল্লে—ছিরুদা, রেকর্ডখানা আর একবার দেবে?

পরক্ষণেই একটি অতি সুপরিচিত, পরমপ্রিয়, সুললিত কণ্ঠের দরদ ভরা সুরপুঞ্জে পাড়ার আকাশ বাতাস, স্তব্ধ জ্যোৎস্না রাত্রিটা ছেয়ে গেল। মানুষের মনের কি ভুলই যে হয়! অল্পক্ষণের জন্যে শান্তির মনে হোল তার কুমারী জীবনের সুখের দিনগুলি আবার ফিরে এসেছে, যেন বৌদিদি মরেনি, কিন্নরের দল ভেঙ্গে যায় নি, সব বজায় আছে। এই তো সামনে আসছে পুজো, আবার মহাষ্টমীতে তাদের থিয়েটার হবে, বৌদিদি গান গাইবে। গান থামিয়ে ওর দিকে চেয়ে হাসি হাসি মুখে বলবে—কেমন শান্তি ঠাকুরঝি, কেমন লাগ্‌লো!